বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৮ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৭

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প: সমস্যা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

নাজনীন আহমেদ*
রিজওয়ানা ইসলাম**
নাহিদ ফেরদৌস পাবন***

১। ভূমিকা

১.১। পটভূমি

শিল্প প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশীয় বাজারে ওষুধ সরবরাহ ইত্যাদি দিক দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ওষুধ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও এ শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এটি হচ্ছে টেকনোলজি স্যাভি মানুফ্যাকচারিং শিল্প যা মূলত শিক্ষিত ও দক্ষ মানুষদের কর্মসংস্থানের যোগানদাতা। দেশের ওষুধ শিল্পের মোট বাজার মূল্য আনুমানিক ২৩৬.৪ (২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিলিয়ন টাকা। দেশে ওষুধের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করে এ খাত। অত্যাবশ্যকীয় ও জরুরি ওষুধ যোগান দেয়ার পাশাপাশি ক্যানসারের মতো জটিল রোগের ওষুধও তৈরি হয় এ খাতে। বিভিন্ন জাতীয় নীতি যেমন শিল্প নীতি, রপ্তানি নীতি ইত্যাদিতে এ খাতকে উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বা থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। দেশে উৎপাদিত ওষুধের ৮০ শতাংশই জেনেরিক ওষুধ আর বাকী ২০ শতাংশ প্যাটেন্ট ওষুধ। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এ শিল্পভুক্ত যেমন অ্যালোপেথিক, হোমিওপেথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ১.৮৩ শতাংশ।

দেশের চাহিদা পূরণে এ শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রী অর্থাৎ ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ খুবই নগণ্য। বাংলাদেশ ইউরোপীয় দেশসমূহ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওষুধ রপ্তানি করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ওষুধ রপ্তানি করে আয় হয় ১৩০ মিলিয়ন ডলার। অনুকূল ওষুধ নীতি ছাড়াও ট্রিপস-এর আওতায় বিভিন্ন নীতিমালা, বিধিবিধান শিথিলকরণের ফলে এ শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটে। অধিকন্তু অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টস (এপিআই) প্রকল্প ইতোমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে। যাহোক বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে উত্তরণের কারণে এ শিল্প নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে অন্য দেশের প্যাটেনেটেড ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। আমদানি করা কাঁচামালের উপর এ শিল্পের অত্যধিক নির্ভরতা একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

ওষুধ শিল্পের প্রকৃত সম্ভাবনা বোঝা এবং এ শিল্পের জন্য যথাযথ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে এ শিল্পের কার্যক্রম, বর্তমান অবস্থা, এ শিল্পের সুযোগ ও সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানা দরকার। ওষুধ শিল্পের উপর পরিচালিত বেশির ভাগ গবেষণাই মূলত গৌণ (secondary) উপাত্তের উপর ভিত্তিশীল

*সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।
**গবেষণা সহযোগী, বিআইডিএস।
***গবেষণা সহযোগী, বিআইডিএস।

(যেমন ভূঁইয়া প্রমুখ ২০১৯)। বর্তমান সমীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক (primary) ও গৌণ উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেশের ওষুধ শিল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

এ প্রবন্ধটি মোট ৫টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে প্রাথমিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে প্রধানত উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়াদি, কর্মসংস্থান, প্রাইসিং ও মুনাফা, সরবরাহ চেইন এবং ট্রেড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে প্রাথমিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে খাত সম্পর্কিত সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর সর্বশেষ অনুচ্ছেদে এগিয়ে যাওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২। গবেষণার উদ্দেশ্য

এ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প খাতের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা। আর এ সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো নিম্নরূপ:

১। এ শিল্পখাতে ইতোমধ্যে অর্জিত পারফরমেন্স পর্যালোচনা করা।

২। এ খাতের বিকাশের পিছনের পলিসি স্পেস এবং অন্যান্য চালিকা শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৩। উৎপাদনের প্রকৃতি, ওষুধের মূল্য নির্ধারণ, রপ্তানি, আমদানি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা মিশ্রণ এবং কর্মসংস্থানের লিঙ্গীয় দিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।

৪। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস ছাড়াও বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৫। এ খাতের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ বিশ্লেষণ করা এবং এ খাতের উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩। গবেষণা পদ্ধতি

এ সমীক্ষা বিভিন্ন ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্তের উপর ভিত্তিশীল। দেশের ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ওষুধ প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী দেশে ২৫৭টি ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদনরত রয়েছে ২১৭টি আর বন্ধ রয়েছে ২৫টি (উৎপাদনে নেই বা উৎপাদন বন্ধ রয়েছে)। উৎপাদনরত বা চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ১৬৪টি বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির সদস্য জরিপভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাছাই করা হয়েছে উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনায়নের মাধ্যমে।[১] বেশির ভাগ ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও এর আশেপাশে অবস্থিত আর বাকীগুলো চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রংপুর, কুষ্টিয়া, সিলেট, ঝিনাইদহ, খুলনা ও বরিশালে অবস্থিত। পূর্বপ্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরিচালিত প্রাথমিক জরিপে ২৬টি ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এ ২৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২টি ঢাকা থেকে, আর ২টি করে প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও বরিশাল থেকে অংশগ্রহণ করে।

[১] আইএম-ম্যাট এর ত্রৈমাসিক উপাত্ত অনুসারে।

সারণি ১: জরিপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিল্পের ধরন	যোগাযোগকৃত মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অবস্থান		
			ঢাকা	চট্টগ্রাম	বরিশাল
ওষুধ শিল্প	৩৫	২৬	২২	২	২

ওষুধ সামগ্রী বিপণন ও বিতরণে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের (এমআর) ভূমিকা উদঘাটন করার লক্ষ্যে দৈবচয়িতভাবে নির্বাচিত ২৫ জন এমআর এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ৫টি প্রধান তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই) পরিচালনা করা হয় ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত ও ধারণা পেতে। তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন ধরনের গৌণ উৎসও ব্যবহার করা হয়।

২। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প: নীতি ক্ষেত্র ও পর্যালোচনা

২.১। ওষুধ শিল্প সম্পর্কিত নীতি ক্ষেত্র

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে ওষুধ শিল্প কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে। বৃহৎ জনসংখ্যা ও উচ্চ জন্মহার ওষুধ সামগ্রীর বিরাট চাহিদার প্রধান কারণ এবং এ খাতের বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেশে হাতেগোণা কয়েকটি ওষুধ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। আশির দশকের পর থেকে ওষুধ শিল্প সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করে। ১৯৮২ সালে ড্রাগ অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ওষুধ বা ফার্মাসিউটিক্যালসকে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আমিন ও সোনোবে (২০১৩) বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পকে সফল করার ক্ষেত্রে শিল্প নীতির বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। চিত্র ১-এ ওষুধ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালার ক্রমধারা দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১: ওষুধ সম্পর্কিত আইন ও বিধিবিধানের ক্রমবিকাশ

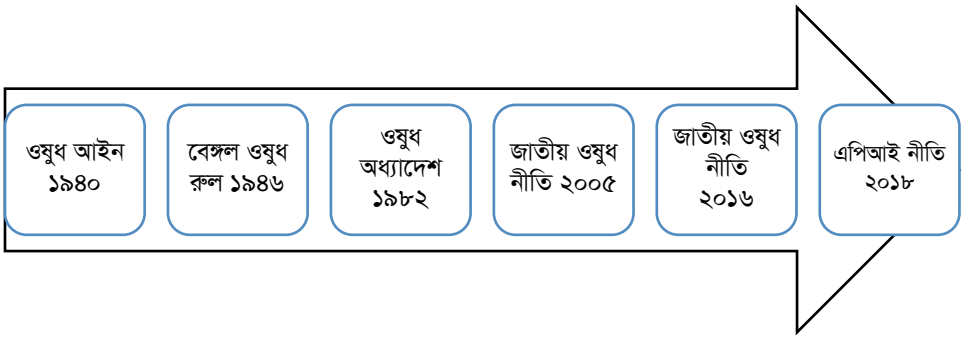

অবিভক্ত ভারতের বঙ্গ প্রদেশে প্রথম ওষুধ আইন প্রবর্তিত হয় ১৯৪০ সালে। এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল এ অঞ্চলে মানসম্মত ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। বেঙ্গল ড্রাগ রুল ১৯৪৬ কর্তৃক ওষুধ আইন ১৯৪৬ কঠোরভাবে অনুসৃত হলেও এ শিল্প জনগণের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষ করে ১৯৮২ সালে প্রথম

ড্রাগ অ্যাক্ট জারী হওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ সর্বাত্বক ও অন্তর্ভুক্তিকর অর্ডিন্যান্স বিকাশমান/বুমিং ওষুধ শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করে। আশির দশকের প্রথমদিকে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প বাজারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য ছিল। তখন দেশে মোট ১১৬ জন লাইসেন্সধারী ওষুধ উৎপাদনকারী ছিল। তাদের মধ্যে মাত্র ৮টি বহুজাতিক কোম্পানি দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৭০ শতাংশ উৎপাদন করত। বাকী ৩০ শতাংশের মধ্যে ১৫ শতাংশ করে বাজার যথাক্রমে ২৫টি মাঝারি ও ১৩৩টি ক্ষুদ্র আকারের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দখলে ছিল। এসব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান মূলত সিম্পল লিকুইড ফর্মুলেশন তৈরি করত। কিছু স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হয়ে কাজ করত, আমদানিকৃত প্রোডাক্টস বিক্রয় করত এবং ওষুধ উৎপাদন করত। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মূলত সিম্পল ড্রাগ ফর্মুলেশন ম্যানুফ্যাকচার করত আর এগুলো ছিল বহুলাংশে নন-এসেনশিয়াল ড্রাগস।

বাংলাদেশ ড্রাগস (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ অনুযায়ী কোনো বিদেশী কোম্পানি কোনো স্থানীয় উৎপাদনকারীর কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে পারবে না যদি না দেশে তাদের নিজস্ব কোনো সেটআপ থাকে (ইসলাম প্রমুখ ২০১৮)। এ অর্ডিন্যান্স অনুসরণ বা বাস্তবায়নের ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য খর্ব হয় এবং দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর (যেমন স্কয়ার ও বেক্সিমকো) বিকাশে সহায়ক হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কিছু বহুজাতিক কোম্পানি তাদের কিছু শেয়ার কিছুসংখ্যক স্থানীয় শেয়ার হোল্ডারের কাছে বিক্রী করে দেয়। এর ফলে অনেকগুলো বহুজাতিক কোম্পানি দেশীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যেমন ফাইজার পরিণত হয় নোটায়, ইমপেরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি এডভান্সড কেমিক্যাল কোম্পানিতে এবং অরগ্যানন পরিণত হয় নুভিস্টায় (আমিন ও সোনোবে ২০১৩, আঙ্কটাড ২০১১)। কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান যেমন ইনসেপটা ওষুধ শিল্প জগতে প্রবেশ করে।

অত্যাবশ্যক ও জরুরি ওষুধের মান বজায় রাখতে এবং ওষুধের দাম সর্বনিম্ন প্রতিযোগিতামূলক স্তরে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে এ অর্ডিন্যান্স প্রশাসনিক ও আইনগত সহায়তা ও সমর্থনের ব্যবস্থা করে। এ অধ্যাদেশের আরও লক্ষ্য ছিল বাজার থেকে নন-এসেনসিয়াল ওষুধকে উধাও করে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে স্থানীয় পর্যায়ে ওষুধ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা। ওষুধের অপব্যবহার রোধ এবং ওষুধের যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এ অর্ডিন্যান্সে ওষুধ মনিটরিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন করে। অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত বিধিবিধান আধুনিক ওষুধ শিল্পের ভিত্তি তৈরি করে ।

১৯৮২ সালের ড্রাগ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয় ২০০৫ ও ২০১৫ সালের ওষুধ নীতির মাধ্যমে। ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা হয় এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্সিং ব্যবস্থার আওতায় ওষুধ উৎপাদনের অনুমোদন দেয়া হয় এ শর্তে যে, এসব ওষুধ অবশ্যই রেজিস্ট্রার্ডকৃত হবে একই ব্র্যান্ড নামে অন্তত দুটো উন্নত দেশে যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্স। জাতীয় ওষুধ নীতি ২০০৫ এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কম দামে জরুরি ওষুধের সরবরাহ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। এ একইনীতির আওতায় সাবকন্ট্রাকটিং এর উপর বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার ফলে কতগুলো স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিদেশী কোম্পানিগুলোর সাথে মিলে ওষুধ উৎপাদন ও রপ্তানির কাজ শুরু করে। কেবল জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রেই নয় অধিকন্তু প্যাটেনটেড ওষুধের ক্ষেত্রেও দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু করে।

জাতীয় ওষুধ নীতি ২০১৬-এ পরিষ্কারভাবে ওষুধের নিরাপত্তা, ওষুধের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার, কার্যকর ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ, স্টোরেজ এবং আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা জারী করা হয়। এ সর্বশেষ নীতি সকলের জন্য সাশ্রয়ীমূল্যে মানসম্মত ওষুধ (পূর্ববর্তী নীতির মতো) নিশ্চিত করার উপরই নয় বরং ওষুধের যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ ব্যবহার এবং ডিসপেন্সিং এর উপর দৃষ্টিপাত করে। সকল ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত সেবা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যাতে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি বিদেশী বাজারেও তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিশ্চিত হয়।

ন্যাশনাল অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রিডিয়েন্টস (এপিআই) এবং ল্যাবরেটরি রিএজেন্টস প্রোডাকশন অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট পলিসি ২০১৮ এর লক্ষ্য হচ্ছে এপিআই এর আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা, স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা, রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ এবং এখাতে আরও ১ বিলিয়ন ডলার বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। এ নীতি অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে নিবন্ধীকৃত উৎপাদকরা (এপিআইএর) এবং ল্যাবরেটরী রিএজেন্টরা, জয়েন্ট ভেনচার কোম্পানিগুলোসহ, শর্তহীন ট্যাক্স হলিডে বা শতভাগ কর্পোরেট কর অব্যাহতি পাবে ২০২১-২২ আর্থিক বছর পর্যন্ত। এছাড়া এ নীতিতে রপ্তানির লক্ষ্যে ৩৭০ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ এপিআই মলিকিউলস উৎপাদনে স্বংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

২.২। ওষুধ খাতের পর্যালোচনা

ড্রাগ অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প খাত (অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক খাত) একটি শক্তিশালী খাত হিসেবে দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। বাংলাদেশ এ অঞ্চলে জেনিরিক ওষুধ উৎপাদনের বিকাশমান হাব হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০১৩ সালে এ খাত থেকে ১০২ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আয় হয়, যা বেড়ে ২০১৮ সালে ২০২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয় এবং এখাতের কম্পাউন্ড প্রবৃদ্ধি হয় ১৪.৬৪ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রধানত ৫ ধরনের ওষুধ রয়েছে যেমন অ্যালোপেথিক, হোমিওপেথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, ও হার্বাল। তবে এ সমীক্ষায় কেবল অ্যালোপেথিক জাতীয় ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী এ শিল্পের আওতায় ২৯,৪৮৬ ধরনের নিবন্ধীকৃত অ্যালোপেথিক ওষুধ (এর মধ্যে ৩,৬৫৭টি জেনেরিক ওষুধ), ২,৪০০টি হোমিওপেথিক, ৬,৩৮৯টি ইউনানি এবং ৪,০২৫টি আয়ুর্বেদিক ওষুধ রয়েছে।

চিত্র ২: সংক্ষেপে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস

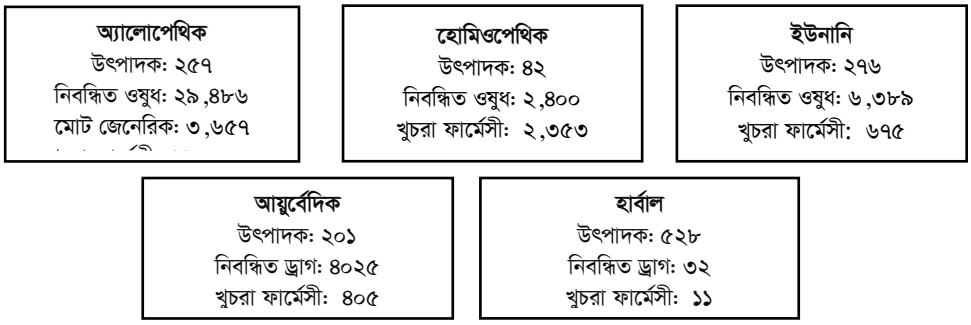

উৎস: ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ২০১৯।

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদেশী প্রতিযোগীদের হাত থেকে বহুলাংশে সুরক্ষিত করা হয়েছে কারণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত একই ধরনের ওষুধ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সারণি ২-এ দেখানো হয়েছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওষুধ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি জিডিপি প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সারণি ২: জিডিপি এবং বাংলাদেশ ওষুধ শিল্পের আকার ও প্রবৃদ্ধি

ইস্যু	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
নমিনাল জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৩৪৩৬.৭৪	১৫১৫৮.০২	১৭৩২৮.৬৪	১৯৭৫৮.১৫	২২৫০৪.৭৯
নমিনাল প্রবৃদ্ধি হার %	১২.০৭	১২.৮	১৪.৩	১৪.০	১৩.৯
ওষুধের বাজার (বিলিয়ন টাকা)	১০৫.৮৬	১১৯.৫৫	১৫৬.৪০	১৮৭.৫৬	২০৫.১২
ওষুধ বাজারের গড় প্রবৃদ্ধি (%)	৮.৫	১৩.০	৩১.০	২০.০	৯.০

উৎস: আইকিউভিআইএ (IQVIA) ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২.২.১ ওষুধ রপ্তানি

দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ মিটিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। রপ্তানির পরিমাণও দ্রুত বাড়ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১২৯.৯৫ মিলিয়ন ডলারের ওষুধ রপ্তানি করে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চেয়ে ২৫.৬ শতাংশ বেশি (সারণি ৩)।

সারণি ৩: বাংলাদেশ থেকে ওষুধ রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০১৪-১৫	৭২.৬৪	-
২০১৫-১৬	৮২.৮২	১৪.০
২০১৬-১৭	৮৯.৮২	৮.৫
২০১৭-১৮	১০৩.৪৬	১৫.২
২০১৮-১৯	১২৯.৯৫	২৫.৬

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিশ্বের ১২১টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে। বাংলাদেশের ওষুধের শীর্ষ ১০টি গন্তব্য দেশ অর্থাৎ রপ্তানি বাজার হলো মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, কেনিয়া, আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, স্লোভেনিয়া ও নেপাল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ওষুধ রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬৯ শতাংশ এসেছে এ ১০টি দেশ থেকে (সারণি ৪)।

উল্লেখ্য যে, রপ্তানি গন্তব্য দেশের ওষুধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নির্দিষ্ট ওষুধের অনুমোদন পাওয়ার পরই বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো অন্যান্য দেশে ওষুধ বিক্রী করতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে ওষুধ রপ্তানি নির্দেশ করে যে দেশে উৎপাদিত ওষুধ আন্তর্জাতিক মানের যা আবার দেশীয় বাজারে একটি কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে।

সারণি ৪: বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানির প্রধান গন্তব্যস্থল (২০১৮-১৯ অর্থবছর)

দেশ	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট রপ্তানি (%)
মিয়ানমার	২০.৯	১৬.১
শ্রীলঙ্কা	১৬.৯	১৩.০
যুক্তরাষ্ট্র	১৩.৭	১০.৫
ফিলিপাইন	৯.২	৭.১
কেনিয়া	৬.১	৪.৭
আফগানিস্তান	৫.৭	৪.৪
ভিয়েতনাম	৫.০	৩.৯
কম্বোডিয়া	৪.৮	৩.৭
স্লোভেনিয়া	৩.৯	৩.০
নেপাল	৩.৩	২.৫
মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	**১২৯.৯**	**১০০.**

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সরবরাহকৃত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে হিসাবকৃত।

২.২.২ ওষুধ আমদানি

বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম হলেও ওষুধ উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের আমদানির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। নূর প্রমুখ (২০১৫) ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের পাশাপাশি ওষুধ উৎপাদন পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন ।

বাংলাদেশের ১৫টি ওষুধ কোম্পানি (স্কয়ার ফার্মা, বেক্সিমকো ফার্মা, গণস্বাস্থ্য, অ্যাকটিভ ফাইন, এসিআই, গ্লোব, অপসোনিন, ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল ও এসকায়েফ ইত্যাদি) ৪০ ধরনের এপিআই উৎপাদন করে (ইবিএল ২০১৯)। এ ১৫টি কোম্পানির মধ্যে কেবল অ্যাকটিভ ফাইন সম্পূর্ণভাবে এপিআই উৎপাদনে নিয়োজিত[২] (অর্থাৎ এটি কোনো ধরনের ফিনিশড ওষুধ তৈরি করে না)। গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস লি: একাই বাংলাদেশে ওষুধ তৈরির কাঁচামালের প্রায় ৬০ শতাংশ উৎপাদন করে। ২০১৫ সালে এপিআই ও এক্সিপিয়েন্টের চাহিদা ছিল আর্থিক মূল্যে ৫৯,৭২০ মিলিয়ন টাকা,[৩] অথচ সে একই বছরে বাংলাদেশ ৫৯,৭২০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের এপিআই ও এক্সিপিয়েন্টস আমদানি করে। বাংলাদেশে ওষুধ তৈরির কাঁচামালের প্রধান উৎস হলো ভারত, চীন, ইতালি ও জার্মানি।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর ২,৮০৫ ধরনের কাঁচামালের অনুমোদিত উৎসের তালিকা প্রদান করে। এসব উৎস থেকে ওষুধ উৎপাদনকারীরা তাদের প্রয়োজন মতো কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে। এ ২,৮০৫ টির মধ্যে দুটো উৎসের নাম ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যায় না। ২,৮০৩ ধরনের কাঁচামালের মধ্যে ৬৭.৫ শতাংশ আমদানি হয় ভারত থেকে, এর পরেই রয়েছে

[২] ওষুধ তৈরির প্রধান উপকরণ হলো এপিআই অর্থাৎ অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টস।

[৩] ওষুধ তৈরিতে এপিআইয়ের সঙ্গে অন্য যেসব উপাদান মেশানো হয় তার নাম এক্সিপিয়েন্টস। এটি নিষ্ক্রিয় উপাদান। এটির অন্তর্ভুক্ত হলো ডিসইন্টিগ্রেটস, গ্লাইডেন্টস, লুব্রিকান্টস, কোটিং ম্যাটেরিয়ালস ইত্যাদি।

যথাক্রমে চীন (১৮.৪ শতাংশ), জার্মানি (২.৮ শতাংশ) ও ইতালির (২.৬ শতাংশ) অবস্থান (সারণি ২.৪)। ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানির অন্যান্য উৎস হলো তাইওয়ান, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, মালয়েশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ইত্যাদি।

সারণি ৫: ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উৎস

উৎস দেশ	আমদানিকৃত আইটেমের সংখ্যা	মোট আমদানিকৃত কাঁচামালের ধরনে উৎস দেশের অংশ	উৎস দেশে ব্যবসার সাথে জড়িত কোম্পানির সংখ্যা
ভারত	১,৮৯৩	৬৭.৫	১৬৯
চীন	৫১৭	১৮.৪	৯১
জার্মানি	৭৮	২.৮	৯
ইতালি	৭৪	২.৬	৯
তাইওয়ান, প্রভিন্স অব চীন	৪২	১.৫	৪
সুইজারল্যান্ড	৩৯	১.৪	২
স্পেন	৩৩	১.২	৪
মালয়েশিয়া	২৮	১.০	১
অন্যান্য (জাপান, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ইত্যাদি)	৯৯	৩.৫	২১
মোট	২,৮০৩	১০০.০	৩১০

উৎস: ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

২.৩। ওষুধ বাজারের শীর্ষ কোম্পানিগুলো

বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো সাধারণত ব্রান্ডেড জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করে।[৪] দেশের শীর্ষ ১০টি কোম্পানি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৭০ শতাংশ উৎপাদন করে (সারণি ৬)। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশের ওষুধ বাজারে শীর্ষস্থানে রয়েছে স্কয়ার, তারপরেই রয়েছে যথাক্রমে ইনসেপটা ও বেক্সিমকো। গত কয়েক বছর যাবৎ ওষুধ বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির হিস্যা কমবেশি একই অবস্থায় রয়েছে।

[৪] ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ হচ্ছে এমন এক ধরনের ওষুধ যাতে অরিজিনালভাবে তৈরি, প্যাটেনটেড ও উদ্ভাবিত ওষুধের ন্যায় একই রাসায়নিক উপাদান থাকে। অরিজিনাল ওষুধের পেটেন্ট মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর জেনেরিক ওষুধ বিক্রী করার সুযোগ দেয়া হয়। অরিজিনাল ওষুধের মতো জেনিরিক ওষুধে একই ধরনের এপিআই থাকলেও কিছু দিক দিয়ে এটি অরিজিনাল ওষুধ থেকে আলাদা যেমন উৎপাদন প্রক্রিয়া, ফর্মুলেশন, এক্সিপিয়েন্টস, রং, স্বাদ ও প্যাকেজিং।

সারণি ৬: বাংলাদেশের শীর্ষ ওষুধ কোম্পানিগুলোর মার্কেট শেয়ার

শীর্ষ কোম্পানির নাম	বিভিন্ন বছরে অভ্যন্তরীণ বাজারে অংশ (%)				
	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
স্কয়ার	১৮.৬	১৮.৭	১৮.২	১৭.২	১৭.০
ইনসেপটা	১০.৩	১০.২	১০.৩	১০.৬	১১.১
বেক্সিমকো	৮.৫	৮.৬	৮.৪	৮.৪	৮.৩
রেনাটা হেলথকেয়ার	৫.৫	৫.৩	৫.০	৫.১	৫.২
হেলথকেয়ার	২.৮	৩.৪	৪.২	৪.৮	৫.৮
অপসোনিন	৫.৬	৫.৫	৫.৬	৫.৪	৫.১
এসিআই	৪.১	৪.৩	৪.৪	৪.৬	৪.৪
এসকায়েফ	৪.৫	৪.৪	৪.৪	৪.৪	৪.৪
এরিস্টোফার্মা	৪.৫	৪.৫	৪.৪	৪.৩	৪.১
একমি	৪.০	৩.৮	৪.০	৩.৭	৩.৫
অন্যান্য	৩১.৬	৩১.৩	৩১.১	৩১.৫	৩১.১
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: IQVIA উপাত্ত (ইবিএল ২০১৯ এ উদ্ধৃত)।

২.৪। নিয়ন্ত্রক সংস্থা

বাংলাদেশে ওষুধ উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার মন্ত্রণালয়ের অধীন। এটি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১০ সালে এটিকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত করা হয়। এটি ওষুধ সম্পর্কিত বিধিবিধান তদারক ও বাস্তবায়ন করে। অ্যালোপেথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ও হার্বাল (ভেষজ) এবং হোমিওপ্যাথিক সহ সকল ধরনের ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী সংগ্রহ, বিক্রয় ও মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যালোপেথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি, হার্বাল ও হোমিওপেথিক ওষুধ উৎপাদকদের সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (মনিটর) করে। অধিকন্তু ওষুধের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসেবেও কাজ করে-এ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ২৮৫ ধরনের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের (অ্যালোপেথিক) দাম নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল

এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। ফার্মেসী অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা বাংলাদেশে ফার্মেসী প্র্যাকটিস নিয়ন্ত্রণ করা।

৩। জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

আইকিউভিআইএ (২০১৯) এর তথ্যানুযায়ী ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিশ্ব ওষুধ বাজারের প্রবৃদ্ধি ৩ থেকে ৬ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি

হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে ওষুধ সামগ্রীর ব্যবহার মাল্টিপ্লাইয়িং হবে। ক্রেমার (২০১২) উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশেষ করে ক্ষুদ্র বাজারগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন, ডিসটিনক্ট ডিজিজ এনভায়রনমেন্ট ও দুর্বল স্বাস্থ্যসেবা এবং রেগুলেটরী ব্যবস্থার উপর ফোকাস করেন। অধিকন্তু এ সমীক্ষায় পার্থক্যমূলক প্রাইসিং, স্বাস্থ্যে বিদেশী সাহায্য/সহায়তার অগ্রাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ওষুধের অপব্যবহার রোধের সম্ভাবনা, ড্রাগ রেগুলেশন, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রোডাক্টের উপর গবেষণা ও উন্নয়নে (আরএন্ডডি) উৎসাহিত করতে ধনী দেশগুলো বা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সম্ভাবনা (প্রয়োজনে নতুন উদ্ভাবিত প্রোডাক্ট ক্রয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা) ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়। দ্রুত বর্ধনশীল বা বিকাশমান আন্তর্জাতিক বাজারে অংশ নিতে বা এর অংশীদার হতে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য সংযোজন বেড়ে যেতে পারে যদি বাংলাদেশ ওষুধ তৈরির কাঁচামাল (বিশেষ করে এপিআই) উৎপাদন করতে পারে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে বাংলাদেশের এসব সম্ভাবনা বের হয়ে এসেছে।

৩.১। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে বেসরকারি মালিকানাধীন স্থানীয় কোম্পানিগুলোর আধিপত্য রয়েছে। সমীক্ষায় আওতায় জরিপকৃত ২৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৫টিই ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যৌথ মালিকানাধীন (সারণি ৭)। মালিকানা স্বত্বের আইনি দিক দিয়ে ১৮টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ৭টি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং একটি একক মালিকানা কোম্পানি। কোম্পানির মালিকদের বেশির ভাগই (৭২ শতাংশ) পুরুষ। আর ২৮ শতাংশ কোম্পানির মালিক নারী। প্রতিটি কোম্পানির আওতায় গড়ে ১.৩৬টি ফ্যাক্টরি রয়েছে, সর্বোচ্চ ৩টি থেকে সর্বনিম্ন ১টি। আরও দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনে যেতে (প্রতিষ্ঠার পর) গড়ে প্রায় ২ বছর লেগে যায়।

সারণি ৭: জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা ধরন

মালিকানা স্বত্ব	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানের (%)
সরকারি	০	০
বেসরকারি/ব্যক্তি	২৫	৯৬.১৫
যৌথ উদ্যোগ (বিদেশী প্রতিষ্ঠানসহ)	১	৩.৮৫
মোট	২৬	১০০.০
আইনি অবস্থা		
একক	১	৩.৮৫
যৌথ	০	০
প্রাইভেট লি: কোম্পানি	১৮	৬৯.২৩
পাবলিক লি: কোম্পানি	৭	২৬.৯২
সরকারি/জাতীয়কৃত	০	০
মোট	২৬	১০০.০
লিঙ্গ		
পুরুষ	৫১	৭১.৮৩
মহিলা	২০	২৮.১৭
মোট	৭১	১০০.০০

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

জরিপকৃত ২৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ণওভারের পরিমাণ ১২,০০০ মিলিয়ন টাকার বেশি, ৯টি কোম্পানির ২৫০-১২০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১০টি প্রতিষ্ঠানের টার্ণওভারের পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত। আরও দেখা গেছে, যেসব প্রতিষ্ঠানের টার্ণওভারের পরিমাণ যত বেশি তাদের ফিক্সড/স্থায়ী সম্পদের পরিমাণও তত বেশি (সারণি ৮)।

সারণি ৮: জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

বৈশিষ্ট্য	ফার্মের সংখ্যা	স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)		
ফার্মের টার্ণওভার		গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
২৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত	১০	১,১৫৩	৪	৭,৭৪৪
২৫০-১২,০০০ মিলিয়ন টাকা	৯	১,৭২০	১১৭	৫৮৪২
১২,০০০ মিলিয়ন টাকার উর্ধ্বে	৭	১০,০৮১	৮৪৮	২৫,৬৪৫
মোট	২৬			
ওষুধ উৎপাদন				
উৎপাদিত ব্রান্ডেড জেনিরিক ওষুধের সংখ্যা	২৬	১৬৯	১	৪৫০
উৎপাদিত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সংখ্যা	২৬	৫৩	০	২৮৫

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

উপরোক্ত তথ্য এটাই নির্দেশ করে যে, প্রতিষ্ঠান যত বড় হবে তার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সক্ষমতাও তত বেশি হবে। জরিপকৃত সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৪টি প্রতিষ্ঠান নতুন মেশিন ক্রয় করেছে। এ ২৪টির মধ্যে ১৪টি কোম্পানিতে পুরনো মেশিনের জায়গায় কিছু নতুন মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কি সংখ্যক মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে ৪৩ শতাংশ জানায় যে তারা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করেছে আর ৫৭ শতাংশ জানায় যে তারা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপন করেছে।

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটিই গড়ে ১৬৯ ধরনের ব্রান্ডেড জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করে তবে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে। নমুনায় অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই পেটেন্টকৃত ওষুধ উৎপাদন করে না। জাতীয় ওষুধ নীতি ২০১৬ তে ২৮৫টি অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। ধারণা করা হয়, প্রতিষ্ঠান যত বড় হবে তার উৎপাদিত ওষুধও তত বৈচিত্র্যময় হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর একক (ইউনিট) প্রতি মোট উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার উপাত্ত তুলনা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিগত ৫ বছরের ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন হার পরিমাপ করা হয়েছে।[৫]। অন্য যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর আউটপুট ভিন্ন হওয়ায় কেবল তাদের উৎপাদন ভ্যালু পরিমাপ করে ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। এজন্য উৎপাদন সম্পর্কিত উপাত্ত বিভিন্ন ওষুধের ইউনিট উৎপাদন ও পরিমাণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[৫] ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন হার= উৎপাদনের মোট ইউনিট/উৎপাদনের মোট ক্ষমতা। ইউনিট পর্যায়ের (ফার্ম পর্যায়ে নয়) বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৯৩টি ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন হার ১০০ শতাংশের নিচে নেমে গেছে।

চিত্র ৩: জরিপকৃত ফার্মগুলোর ক্যাপাসিটি ব্যবহার

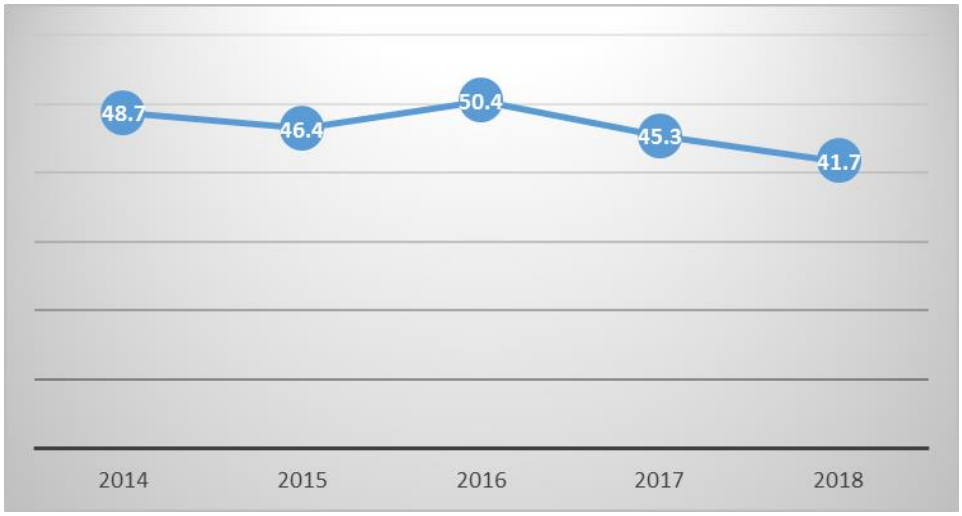

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

চিত্র ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন কমছে, ২০১৪ সালের ৪৮.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১৮ সালে ৪১.৭ শতাংশ হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, যে পরিমাণ নতুন মেশিন স্থাপন করা হয়েছে সে অনুযায়ী উৎপাদন বাড়েনি।

৩.২। কর্মসংস্থানের ধরন

শিল্প প্রতিষ্ঠান জরিপ (২০১২) অনুসারে[৬] দেশের ওষুধ শিল্পে মোট ৭১,৩৮০ জন নিয়োজিত রয়েছে। তাদের ৮৬ শতাংশ পুরুষ আর ১৪ শতাংশ নারী। উপাত্ত থেকে দেখা যায়, নিয়োজিতদের বেশির ভাগই উৎপাদন শ্রেণীভুক্ত, তারপরেই রয়েছে বিক্রয় কাজের সাথে সংশ্লিষ্টরা (সারণি ৯)।

সারণি ৯: এসএমআই অনুসারে ওষুধ শিল্পে কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থানের ধরন	মোট কর্মসংস্থান	পুরুষ %	মহিলা %
প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপকীয়	৭,৮৭৯	৯৪.০	৬.০
করণিক ও বিক্রয় কর্মী	২৩,৬২৬	৯৫.০	৫.০
উৎপাদন ও তৎসম্পর্কিত কর্মী	৩৪,১১৯	৮০.০	২০.০
ওয়ার্কিং মালিক/প্রোপাইটর/পার্টনার	৩৯৫	৯০.০	১০.০
অস্থায়ী শ্রমিক	৫,৩৪৭	৭৩.০	২৭.০
মোট	৭১,৩৬৬	৮৬.০	১৪.০

উৎস: এসএমআই ২০১২।

[৬] সর্বশেষ এসএমআই জরিপ ২০১২ এর উপাত্ত পাওয়া যায়। এসএমআই ২০১৯ এর কাজ সম্পন্ন হলেও এর প্রতিবেদন এখনো প্রস্তুত হয়নি।

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসংস্থান সম্পর্কিত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ খাতের প্রধান পেশাগুলো হলো ফার্মাসিস্ট, কেমিস্ট, বায়োকেমিস্ট, অন্যান্য কারিগরি কর্মী, প্রশাসনিক কর্মী, বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেনটিটিভ, কারিগরি বহির্ভূত কর্মী এবং অন্যান্য কর্মী (গাড়ী চালক, অফিস সহকারী, গার্ড ইত্যাদি) (সারণি ১০)।

সারণি ১০: জরিপকৃত ফার্মগুলোর কর্মসংস্থান চিত্র

কর্মীর ধরন	নিয়োজিত কর্মীর %	স্থায়ী কর্মীর গড় সংখ্যা		অস্থায়ী কর্মীর গড় সংখ্যা	
	মোট	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
ফার্মাসিস্ট	৪	৭৪	২৪	০	০
কেমিস্ট	২	৪৩	৭	০	০
বায়োকেমিস্ট	১	১০	৩	০	০
অন্যান্য কারিগরি কর্মী	৬	১১২	২৭	০	০
প্রশাসনিক কর্মী	৫	৯১	৩০	০	০
বিক্রয় প্রতিনিধি	১৯	৩১৭	১৫০	৩	০
মেডিক্যাল প্রতিনিধি	৪৬	১,১৩৫	১৩	১৭	০
উৎপাদন সম্পর্কিত (কারিগরি বহির্ভূত) কর্মী	১৭	৩৩৮	৯৩	৭	৩
অন্যান্য (ড্রাইভার, অফিস সহকারী, গার্ড ইত্যাদি)	১	৩২	০	০	০

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

ওষুধ কোম্পানিগুলোতে নিয়োজিত কর্মীদের বেশির ভাগই মেডিকেল রিপ্রেজেনটিটিভ (৪৬ শতাংশ)। তারপরেই রয়েছে যথাক্রমে বিক্রয় প্রতিনিধি (১৯ শতাংশ) ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট (অকারিগরি) কর্মী (১৭ শতাংশ) (সারণি ১১)। সকল ধরনের পেশায় নারী কর্মীর চেয়ে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা বেশি। গৌণ উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য হিসাব করে একই চিত্র লক্ষ করা গেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীর চাকুরীই স্থায়ী। অস্থায়ী কর্মী নেই বললেই চলে।

সারণি ১১: ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কর্মীর অংশ/শতকরা হার

পেশার নাম	মোট কর্মসংস্থানের %
ফার্মাসিস্ট	৪.০
কেমিস্ট	২.০
বায়োকেমিস্ট	১.০
অন্যান্য কারিগরি	৬.০
প্রশাসনিক	৫.০
বিক্রয় প্রতিনিধি	১৯.০
মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভ	৪৬.০
উৎপাদন সম্পর্কিত (অকারিগরি)	১৭.০
অন্যান্য (গাড়ী চালক, অফিস সহকারী, গার্ড ইত্যাদি)	১.০
মোট	১০০.০

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

নিয়োজিত কর্মীদের বেশিরভাগই পুরুষ (৮৬.১ শতাংশ)। নারী কর্মীদের তিনটি প্রধান ক্যাটাগরি হলো বিক্রয় প্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ফার্মাসিস্ট (সারণি ১২)।

সারণি ১২: ফার্মগুলোতে জেন্ডারভিত্তিতে নিয়োজন

পেশার নাম	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
ফার্মাসিস্ট	৭৫.৫	২৪.৫
কেমিস্ট	৮৬.০	১৪.০
বায়োকেমিস্ট	৭৬.৯	২৩.১
অন্যান্য কারিগরি	৮০.৬	১৯.৪
প্রশাসনিক	৭৫.২	২৪.৮
বিক্রয় প্রতিনিধি	৬৭.৯	৩২.১
মেডিকেল রিপ্রেজেনটিটিভ	৯৮.৯	১.১
উৎপাদন সম্পর্কিত (অকারিগরি)	৭৮.৪	২১.৬
অন্যান্য (গাড়ী চালক, অফিস সহকারী, গার্ড ইত্যাদি)	১০০	০.০
মোট	**৮৬.১**	**১৩.৯**

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

সকল শ্রেণির কর্মীকে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল বিক্রয় প্রতিনিধিরা কারণ তাদেরকে অফিসের বাইরে যেতে হয় বিধায় অন্যদের চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে হয়।

৩.৩। ওষুধের দাম নির্ধারণ

অন্য যেকোনো শিল্প উৎপাদের সাথে ওষুধ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের পার্থক্য রয়েছে এ অর্থে যে এসব প্রোডাক্ট অত্যাবশ্যকীয়, জরুরি ও জীবনরক্ষাকারী। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহদাংশ দরিদ্র হওয়ায় ওষুধের দাম নির্ধারণ পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সকল জনগণের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করে। ওষুধের বাজার কঠোরভাবে মনিটর করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত কিছু অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দামের সিলিং নির্ধারণ করে দেয়া ছাড়াও এ শিল্পের অন্যান্য ওষুধের দাম ঠিক করা হয় তাদের উৎপাদন খরচ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। এ সমীক্ষায় দেশী ও বিদেশী বাজারের জন্য ওষুধের দাম নির্ধারণের নির্ণায়কসমূহ উদঘাটনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায়, আমদানিকৃত কাঁচামালের দাম, সরকারি নীতি (দেশের অভ্যন্তরে), অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা এবং প্রোডাক্টের গুণগতমান দেশে উৎপাদিত ওষুধের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। বিদেশী বাজারের ক্ষেত্রে প্রধান নির্ণায়কসমূহ হলো আমদানিকৃত কাঁচামালের দাম, বিপণন (মার্কেটিং) বাবদ ব্যয়, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি, বিদেশী সরকারের নীতি এবং রপ্তানি কর।

সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বাজারের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের ক্ষেত্রে উৎপাদকরা দামে তারতম্য করতে পারবে না। সরকার নির্ধারিত দামেই করতে হবে। এই জরিপে বিভিন্ন উৎপাদনকারীর অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য ওষুধের দামের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য হয় কিনা তা বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণি ১৩: দামের ক্ষেত্রে তারতম্য: প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ (জরিপ উপাত্ত)

নির্বাচিত ওষুধের গড় একক দাম (টাকায়)

জেনেরিক ওষুধের নাম	অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ কিনা?	পর্যবেক্ষণের সংখ্যা (ফার্ম)	গড় একক দাম (টাকা)	আদর্শ বিচ্যুতি (টাকা)	সর্বনিম্ন দাম (টাকা)	সর্বোচ্চ দাম (টাকা)
এজিথ্রোমাইসিন ৫০০ এমজি টেবলেট	না	১৩	৩২.৩	৯.৭	২২.৫	৫৫
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ৫০০ এমজি টেবলেট	না	৮	৯.১	৩.১	৫.২	১৪
ওমেপ্রাজোল ২০ এমজি ক্যাপসুল	হ্যা	১১	৪.৪	৩.২	২.২	১৪

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ৫০০ মিলিগ্রামের একটি এজিথ্রোমাইসিন টেবলেট গড়ে ৩২.৩ টাকায় বিক্রী হয় এবং এই ট্যাবলেটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম যথাক্রমে ২২.৫ ও ৫৫ টাকা। অন্যদিকে ৫০০ মিলিগ্রামের একটি সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ট্যাবলেট গড়ে ৯.১ টাকা এবং এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম যথাক্রমে ৫.২ টাকা ও ১৪ টাকা। ২০ মিলিগ্রামের ওমেপ্রাজোল ক্যাপসুলের দাম গড়ে ৪.৪ টাকা এবং এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম যথাক্রমে ২.২ ও ১৪ টাকা (সারণি ১৩)। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম থেকে একই ওষুধের দামের ক্ষেত্রে বিরাট তারতম্য লক্ষ করা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণ/ত্রিগুণেরও বেশি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ওমেপ্রাজোল ২০ এমজি ক্যাপসুল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ হওয়া সত্ত্বেও দামের ক্ষেত্রে তারতম্য আছে। কাজেই মনিটরিং আরও জোরদার করা দরকার।

দামের তারতম্য: সেকেন্ডারি বা বাহ্যিক উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

ওষুধের দামে তারতম্য হওয়ার বিষয়ে একটি ব্যাপক চিত্র পাওয়ার লক্ষ্যে বিডিড্রাগস (অনলাইন ডিপোজিটরি) নামক একটি *সেকেন্ডারি* বা বাহ্যিক উৎস থেকে ১০টি নির্বাচিত ওষুধের খুচরা দাম সংগ্রহ করা হয়। তবে এ সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রতিষ্ঠানের আকারের উপর ভিত্তি করে দামের তারতম্যর বিষয়টি দেখার সুযোগ নেই। এজন্য দামের তারতম্য বোঝার জন্য একক দামের গড়, আদর্শ বিচ্যুতি ও ইউনিট দামের বিস্তারের (mean, standard deviation, and range of unit prices) উপর নির্ভর করা হয়েছে (সারণি ১৪)।

সারণি ১৪: সেকেন্ডারি বা বাহ্যিক উৎস থেকে নির্বাচিত ওষুধের গড় একক দাম (টাকায়)

জেনেরিক ওষুধের নাম	অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ কিনা?	পর্যবেক্ষণের সংখ্যা (ফার্ম)	গড় একক দাম	আদর্শ বিচ্যুতি (টাকা)	সর্বনিম্ন দাম (টাকা)	সর্বোচ্চ দাম (টাকা)
এমবক্সল হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১৫এমজি/৫এমএল সিরাপ	না	২৫	৩.৩	০.২	২.৫	৩.৬
এজিথ্রোমাইসিন ৫০০ এমজি টেবলেট	না	৪৮	৩০.০	৩.৫	২৪.০	৫০.৬
সেফিক্সাইম ২০০ এমজি ক্যাপসুল	না	২২	২৭.০	৩.৭	২৫.০	৪০.৭
সেফ্রাডাইন ৫০০ এমজি ক্যাপসুল	না	৩৫	১১.৬	২.১	৬.০	১৫.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ৫০০ এমজি টেবলেট	না	৮৫	১১.৮	২.৩	৫.০	১৫.০
ফ্লুক্লোক্সাসিলিন ৫০০ এমজি ক্যাপসুল	হ্যাঁ	৮	৯.৬	০.৭	৮.০	১০.০
গ্লিক্লাজাইড ৮০ এমজি টেবলেট	না	৩২	৫.৯	২.৩	৪.৫	১৮.০
মেট্রোনিডাজোল ৪০০ এমজি টেবলেট	হ্যাঁ	৫৩	১.০	০.১	০.৫	১.৩
ওমেপ্রাজোল ২০এমজি ক্যাপসুল	হ্যাঁ	৭৮	৩.৮	০.৭	০.৯	৫.৯
প্যারাসিটামল ৫০০ এমজি টেবলেট	হ্যাঁ	৬৭	০.৬	০.১	০.৩	১.৩

উৎস: http://bddrugs.com/ as of January 2020.

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এক বোতল এমব্রক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড (বিপি ১৫ এমজি/৫ এমএল) সিরাপ বিক্রি হয় ৩.৩ টাকায় যার আদর্শ বিচ্যুতি ০.২ টাকা। ২৫টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দাম ২.৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ দাম ৩.৬ টাকা। ৫০০ মিলিগ্রামের একটি এজিথ্রোমাইসন টেবলেটের গড় দাম ৩০ টাকা, আদর্শ বিচ্যুতি ৩.৫ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম ২৪ টাকা ও ৫০.৬ টাকা। অন্যদিকে ৫০০ মিলিগ্রামের সিপ্রোফ্লোক্সাসিন টেবলেটের গড় একক দাম ১১.৮ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম ৫ টাকা ও ১৫ টাকা।

মোটকথা, সারণিতে উল্লেখিত সকল ওষুধের দামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা গেছে। উপরের তালিকার চারটি ওষুধ সরকারের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকাভুক্ত। নীতিগতভাবে এই ওষুধের দাম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ হওয়ায় দামের ক্ষেত্রে তারতম্য হওয়ার কথা নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম কঠোর ও শক্তভাবে মনিটর করা প্রয়োজন যাতে দামের এরূপ তারতম্যের কারণ কি তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কারণ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দামের ক্ষেত্রে এরূপ তারতম্য হওয়া উচিত নয়। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকাভুক্ত নয় এমন ওষুধের ক্ষেত্রে নানা কারণে দামের তারতম্য হতে পারে। ওষুধের মান, প্যাকেজিং এর তারতম্য, দাম বাড়লে তা অনেকে বেশি ভালো ওষুধ মনে করবে ইত্যাদি কারণে দামের তারতম্য হয়ে থাকে।

৩.৪। টার্ণওভার ও মুনাফা

শেহেরার যুক্তি দেন যে, উন্নত দেশগুলোতে ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা মার্জিন উচ্চ হওয়ায় তারা গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) খাতে উচ্চ বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়ে থাকে যা আবার এ খাতের দ্রুত অগ্রগতিতে সহায়তা করে। এজন্য প্যাটেন্ট এর মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে এক সময়ে নতুন যেসব ওষুধ পুরনো হয়ে যাবে সেসব ওষুধ সম্পর্কে তথ্য জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সারণি ১৫: জরিপকৃত ফার্মগুলোর বার্ষিক টার্ণওভার

বছর	ফার্মের সংখ্যা	গড় (প্রতিষ্ঠানগুলোর গড় টার্ণওভার (মিলিয়ন টাকা)	আদর্শ বিচ্যুতি (মিলিয়ন টাকা)	সর্বনিম্ন (মিলিয়ন টাকা)	সর্বোচ্চ (মিলিয়ন টাকা)
২০১৪	২৫	৬৬২	১২,১০০	৭৩,৫৭৪	৫৬,০০০
২০১৫	২৫	৭,৪৬০	১৩,১০০	৮৪,৫৮৯	৫৭,০০০
২০১৬	২৬	৬,৮২০	১২,৮০০	৮৪,৫৮৯	৫৮,০০০
২০১৭	২৬	৭,১০০	১২,৮০০	৯৭,৮২৫	৫৯,০০০
২০১৮	২৬	১১,০০০	১৬,৬০০	১১৭,৩৮৪	৬০,০০০

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

জরিপে সংগৃহীত বার্ষিক টার্ণওভারের উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, গত ৫ বছরে প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক টার্ণওভার বেড়েছে। এ থেকে এ শিল্পে যে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি হয়েছে তা বোঝা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ণওভার ৮-৯ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে।[৭]

সারণি ১৬: জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক মুনাফা (%) (জরিপকৃত ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত)

বছর	ফার্মের সংখ্যা	গড় (ফার্মগুলোর গড় মুনাফা) শতাংশে	আদর্শ বিচ্যুতি	সর্বনিম্ন বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে	সর্বোচ্চ বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে
২০১৪	২৪	৮.৩৫	১২.০৯	২০.০	৩৫.০
২০১৫	২৪	৯.০৮	১১.৩৬	১৫.০	৩৩.০
২০১৬	২৫	৯.২৩	১০.৬৮	১০.০	৩৪.০
২০১৭	২৫	৯.৬৩	১০.০৮	৫.০	৩৪.০
২০১৮	২৫	৯.০৬	১২.৫৫	৩০.০	৩৫.০

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৩.৫। ওষুধের সরবরাহ চেইন

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সরবরাহ চেইন গঠিত হয় কোনো একটি পণ্যের ডিজাইন, এসেম্বলি ও ডেলিভারীর সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোকে নিয়ে। ওষুধের সরবরাহ চেইনও একই রকমভাবে গঠিত

[৭]মুনাফার হার পরিমাপ করা হয়নি বরং উত্তরদাতারা সরবরাহ করেছেন।

হয়। আবার ওষুধের উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ, বিপণন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকেন নানান কর্তৃপক্ষ। যেমন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত মার্কেটিং প্রতিনিধি, ডাক্তার, হাসপাতাল/ ক্লিনিক, ওষুধের বিক্রয়কারী ফার্মেসি, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ইত্যাদি। নানা স্টেকহোল্ডারদের মধ্যকার সম্পর্কের ধরণ এবং একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ওষুধের দাম এবং তাঁর প্রাপ্যতায় ভূমিকা রাখে। ইসলাম প্রমুখ (২০১৮) ওষুধের গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএণ্ডডি) বিষয়াদি, ওষুধের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং ওষুধ শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তাকল্পে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখার নিমিত্তে প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নৈতিকতা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। পাশাপাশি এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণভিত্তিক (এভিডেন্স বেইজড) এপ্রোচ অনুসরণের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

ওষুধ শিল্পের সরবরাহ চেইনের প্রথম ধাপ হলো নতুন ও উন্নতমানের ওষুধ উদ্ভাবন। সরবরাহ চেইনের এ ধাপটির সাথে বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো খুব বেশি সম্পৃক্ত নয় (জরিপের কেইস স্টাডি থেকেও তা দেখা গেছে)। এ শিল্পে যে যৎসামান্য আরএন্ডডি হয় তার বেশির ভাগই ওষুধ তৈরির জন্য নতুন কম্বিনেশন প্রণয়ন সম্পর্কিত। জরিপকৃত ২৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭টি (৬৫ শতাংশ) আরএন্ডডির পিছনে অর্থ ব্যয় করে কিন্তু বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো এজন্য অর্থ ব্যয়ে ইচ্ছুক নয়। ভূঁইয়া প্রমুখের (২০১১) বেশ কিছু গবেষণায় ওষুধের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বায়ো-ইক্যুইভেলেন্স টেস্ট সুবিধাদি স্থাপনের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে রেসনিক (২০০১) এর মতো অন্যান্য গবেষণায় বলা হয়, দেশ তথা জাতির প্রতি ওষুধ কোম্পানিগুলোর কিছু সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে যা তারা পালন করতে পারে ওষুধ উদ্ভাবন করে, কম দামে ওষুধ উৎপাদন করে এবং ওষুধ গিভএওয়েজ এর মাধমে। উক্ত সমীক্ষায় বৈশ্বিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর প্রতি উন্নত দেশগুলোর ভূমিকা ও কর্তব্যের উপর গুরুত্বারোপ করে বলা হয় উন্নত দেশগুলো স্থিতিশীল মুদ্রা ও নিশ্চিত বাজারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে রেসনিক এর সমীক্ষায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরএন্ডডির উপর কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

সারণি ১৭: জরিপকৃত ফার্মগুলোর আরএন্ডডি বাবদ ব্যয়

আরএন্ডডি ব্যয়	ফার্মের সংখ্যা	শতকরা হার
আরএন্ডডি খাতে অর্থব্যয়কারী ফার্ম	১৭	৬৫.৩৮
আরএন্ডডি খাতে ব্যয় করে না এমন ফার্ম	৯	৩৪.৬২
মোট	২৬	১০০.০
নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ		
নতুন ওষুধ উদ্ভাবন	ফার্মের সংখ্যা	শতকরা হার
উদ্যোগ নেয়া হয়েছে	৬	২৩.০৮
উদ্যোগ নেয়া হয়নি	২০	৭৬.৯২
মোট	২৬	১০০.০

উৎস: জরিপের উপাত্ত থেকে হিসাবকৃত।

ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক টার্ণওভারের বিবেচনায় আরএন্ডডি খাতে বিনিয়োগ অনুল্লেখযোগ্য। ২০১৪ সালে আরএন্ডডি বাবদ বিনিয়োগ ছিল মোট টার্ণওভারের ২ শতাংশ, যা বেড়ে ২০১৮ সালে ৪ শতাংশে উন্নীত হয়। এ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হলেও তা এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট

নয়। যাহোক উল্লেখ্য যে, জরিপকৃত ২৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৬টি প্রতিষ্ঠান নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করে (সারণি ১৭)।

সারণি ১৮: জরিপকৃত ফার্মগুলোর আরএন্ডডি বাবদ ব্যয় (বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে)

বছর	ফার্মের সংখ্যা	গড় আরএন্ডডি ব্যয় (বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে)
২০১৪	১৬	১.৮৮
২০১৫	১৬	২.১৯
২০১৬	১৭	২.৬৮
২০১৭	১৭	৩.০২
২০১৮	১৭	৩.৬৪

উৎস: জরিপের উপাত্ত থেকে হিসাবকৃত।

ওষুধ ছাড়করণ সম্পর্কিত কার্যক্রম

জনগণের ব্যবহারের জন্য বাজারে নতুন ওষুধ (অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত হোক বা আমদানিকৃত হোক) ছাড়া হয় আর এ নতুন ওষুধ প্রবর্তনের সাথে জড়িত রয়েছে নানা কর্মকাণ্ড। নতুন ওষুধ প্রবর্তন হলো প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন নীতির অধীন বিষয়। আইন ও বিধিবিধানের কারণে বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের নিজেদের উৎপাদিত ওষুধের সরাসরি প্রমোশন করতে পারে না। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বিস্তারিত কোড অব ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেট প্র্যাকটিসেস (সিআরএমপি) রয়েছে যা ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের প্রমোশনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সিআরএমপি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টের (ব্যতিক্রম হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ওরাল স্যালাইন, এন্টিসেপটিক জাতীয় ওষুধ ইত্যাদি) কোনো ধরনের সরাসরি বিপণন করতে পারে না। ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলো রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রসার ঘটাতে পারে না বা প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না। ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট প্রসারের প্রধান উপায় হলো ব্যক্তি পর্যায়ে বিক্রয় এবং ট্রেড মার্কেটিং। কোম্পানিগুলো জনপ্রিয় চিকিৎসকদের চিহ্নিত করে তাদেরকে তাদের প্রোডাক্ট প্রেসক্রাইব করতে ও কোম্পানির প্রোডাক্টের প্রসারে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বর্তমান সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, একটি নতুন ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের ক্ষেত্রে গৃহীত বিজ্ঞাপন কৌশলের অন্তর্ভুক্ত থাকে চিকিৎসকদেরকে নতুন প্রবর্তিত ওষুধের উপকারিতা বিষয়ে সরসারিভাবে অবহিত করা (৯২ শতাংশ), ফার্মেসীগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন (৪৬ শতাংশ) এবং সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন (২৭ শতাংশ)। অনুমোদিত প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রচারণা কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্যের প্রসার এবং টেলিভিশন, ম্যাগাজিন, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদিতে ওষুধের বিজ্ঞাপন দেয়া।

সারণি ১৯: প্রধান প্রচারণা কৌশলসমূহ

কৌশলসমূহ	পর্যবেক্ষণের সংখ্যা (২৬টি প্রতিষ্ঠান)	% (২৬টি কোম্পানির মধ্যে)
বিপণন প্রতিনিধির মাধ্যমে চিকিৎসকদেরকে ওষুধের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা	২৪	৯২.৩১
ফার্মেসীগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন	১২	৪৬.১৫
হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ স্থাপন	৭	২৬.৯২
বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে এবং বিডিং এ অংশগ্রহণ	৬	২৩.০৮
বিভিন্ন সংগঠন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রসার/প্রচারণা	৫	১৯.২৩
টিভি, ম্যাগাজিন, পোস্টার, লিফলেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা (কেবল অনুমোদিত পণ্যের ক্ষেত্রে)	৩	১১.৫৪
অন্যান্য	৩	১১.৫৪

উৎস: জরিপের উপাত্ত থেকে হিসাবকৃত।

বাণিজ্যিক বিতরণ

ওষুধ সরবরাহ চেইনের একটি বড় অংশ হলো উৎপাদিত ওষুধের বাণিজ্যিক বিতরণ কারণ এ ধাপের মাধ্যমেই জনগণের ব্যবহারের জন্য ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়। ওষুধের চূড়ান্ত চাহিদা ভোক্তাদের কাছ থেকে (যেমন রোগী) আসলেও চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছার আগে চাহিদা কিছু চ্যানেলের মাধ্যমে যায়। কোম্পানিগুলো থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য ক্রয়ের প্রধান ক্রেতা হলো মিডলম্যানরা। মহিউদ্দিন প্রমুখ (২০১৫) দেখিয়েছেন যে, বড় ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের এগ্রেসিভ প্রচারণার কারণে কেন্দ্রীকৃত বাজারে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এ শিল্পের এ অবস্থার জন্য মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে কোম্পানিগুলোর ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা পেশাগত নৈতিকতা, কোড অব কন্ডাক্ট এবং সংবিধিবদ্ধ আইন ও বিধিবিধানের ব্যর্থতাকেই নির্দেশ করে। আমাদের সমীক্ষা থেকেও দেখা গেছে, ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের প্রধান ক্রেতা হলো ব্যক্তি মালিকানাধীন ফার্মেসী ও প্রাইভেট হাসপাতাল এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও কর্মসূচিতে কর্মরত বা নিয়োজিত চিকিৎসকরা (সারণি ২০)। এসব ক্রেতাই আবার ওষুধ কোম্পানিগুলোর মুনাফা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালনকারী।

সারণি ২০: ওষুধের প্রধান প্রধান ক্রেতা

প্রধান ক্রেতা	পর্যবেক্ষণের সংখ্যা	% (২৬টি কোম্পানির মধ্যে	গড় (ফার্মগুলোর গড় মুনাফা) শতাংশে
ব্যক্তি মালিকানাধীন ফার্মেসী	২৫	৯৬.২	৮৪.৯
ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি হাসপাতাল	১৯	৭৩.১	১৫.৭
চিকিৎসক (হাসপাতাল ও কর্মসূচি)	১২	৪৬.২	৭.২
এনজিও	৬	২৩.১	১.৯
দাতা সংস্থা	৬	২৩.১	৩.২
অন্যান্য	১০	৩৮.৫	৬.১

উৎস: জরিপের উপাত্ত থেকে হিসাবকৃত।

দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোর বিপণন বাবদ খরচের অন্তর্ভুক্ত হলো পণ্যের বিজ্ঞাপন ও বিতরণ খরচ এবং রিসোর্স পারসন নিয়োগ ও তাদেরকে সরবরাহ চেইন ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্তকরণ। এসব ব্যয় হলো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিপণন খরচের অংশ। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো গত ৫ বছরে তাদের টার্ণওভারের প্রায় ৩০ শতাংশ ব্যয় করেছে পণ্য বিপণন বা বাজারজাতকরণের পিছনে। দেখা গেছে, ওষুধ বিপণনে কোম্পানিগুলো তাদের টার্ণওভারের ৩-৬০ শতাংশ খরচ করে (সর্বনিম্ন ৩ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ), যা মুনাফা অর্জনে বিপণন কার্যক্রমের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

সারণি ২১: মার্কেটিং বাবদ জরিপকৃত ফার্মগুলোর ব্যয় (বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে)

বছর	ফার্মের সংখ্যা	গড় মার্কেটিং বাবদ ব্যয় (বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে)	আদর্শ বিচ্যুতি	সর্বনিম্ন (বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে)	সর্বোচ্চ (বার্ষিক টার্ণওভারের শতাংশ হিসেবে)
২০১৪	২৫	২৮.৪৫	১৫.৩৭	৪.২৮	৫৭.০
২০১৫	২৫	২৮.৮৯	১৫.১৯	৪.৩৬	৫৬.০
২০১৬	২৬	২৭.৫১	১৬.১৭	৩.০	৫৬.০
২০১৭	২৬	২৮.৫৫	১৬.৩০	৩.৫	৫৭.০
২০১৮	২৬	২৯.৩৬	১৬.৬৯	৪.০	৬০.০

উৎস: জরিপের উপাত্ত থেকে হিসাবকৃত।

বর্তমান সমীক্ষার অংশ হিসেবে দৈবচয়িতভাবে নির্বাচিত ২৫ জন বিপণন প্রতিনিধির (Medical Representative) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানির খরচ ছাড়াও ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপণন খরচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন বিপণন প্রতিনিধিকে ওষুধ বিতরণের টার্গেট (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাসিক) নির্ধারণ করে দেয়া হয় আর টার্গেট পূরণ করতে পারলে বোনাস দেয়া হয়। এই নির্ধারিত টার্গেট মনিটর করা হয় ওষুধ বিক্রয়ের পরিমাণ চেক করে, চিকিৎসকদের চেম্বারে বা হাসপাতালে রোগীদেরকে প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন/চিকিৎসাপত্রের ফটোগ্রাফ মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভ কর্তৃক গ্রহণ করে। স্ব স্ব বিপণন প্রতিনিধিদের সফলতা বা ব্যর্থতার হারের উপর নির্ভর করে এ টার্গেট পুর্ননির্ধারণ করা হয়।

বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে মার্কেটিং প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ডাক্তার, হাসপাতাল ও অন্যান্য সম্মুখ স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করে। ওষুধ এমন একটি পণ্য যার সর্বশেষ ব্যবহারকারী অর্থাৎ রোগী নিজের পছন্দে এটি ক্রয় করেন না, বরং ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি তার রোগের জন্য কোন ঔষধ খাবেন তা সিদ্ধান্ত নেন। কিছু অতি প্রচলিত সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে রোগী নিজের ইচ্ছায় সরাসরি ওষুধ ক্রয় করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ বিক্রয়কারী ফার্মেসির কর্মচারীদের পরামর্শে ওষুধ কেনা হয়। ওষুধের বিক্রি বাড়াতে বিভিন্ন কোম্পানি ডাক্তার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ফার্মেসিগুলোকে নানাভাবে প্রভাবিত করে যাতে তাদের কোম্পানির ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ বা নির্দেশনা দেয়। চিকিৎসকরা যাতে তাদের চিকিৎসাপত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ওষুধ লিখে দেন সেজন্য চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা বাবদ ব্যয়ও বিপণন ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে বিপণন প্রতিনিধিগণ জানান। এটি তাদের বিপণনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু অনেক সময় এই প্রভাবিত করার জন্য এমন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়, যা আসলে ওষুধের মান

নির্ভর নয়। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী বিপণন প্রতিনিধিদের মতে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফার্মেসী ও ডাক্তারদের সামান্য উপহার দেয়া হয় যেমন লেখার প্যাড, কলম, ক্রোকারিজ, ফুড আইটেম, কসমেটিক পণ্য ইত্যাদি। আবার উপহার ব্যয়বহুলও হয়ে থাকে যেমন চিকিৎসকদের জন্য পারিবারিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করা, এয়ারকন্ডিশনার, টেলিভিশন, ফ্রিজ, দামী মোবাইল ফোন ইত্যাদি দেয়া। এভাবে মার্কেটিং বা বিপণন বাবদ খরচ বেড়ে যায় যা শেষতক ওষুধ ব্যবহারকারীদের ঘাড়ে চাপে। এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আরও তদারকি হওয়া দরকার। ডাক্তাররা কোনো বিশেষ কোম্পানির ওষুধ ব্রান্ডের নাম না লিখে যদি ওষুধের জেনেরিক নাম লিখেন তাহলে হয়তো বিপণন বাবদ খরচ কিছুটা কমবে। সে ক্ষেত্রে ফার্মেসির কর্মচারীদের ক্ষমতা বাড়বে, একটি নির্দিষ্ট জেনেরিক নামের বিপরীতে কোন কোম্পানির ওষুধ দেবেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে। এরূপ পদক্ষেপের ফলে বিপণন খরচ কমবে, নাকি কমবে না, সে ব্যাপারে আরও গবেষণা হওয়া দরকার।

৩.৬। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওষুধ রপ্তানি ও আমদানি

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করে। তাদের উৎপাদিত ওষুধের প্রধান রপ্তানি বাজার হলো শ্রীলংঙ্কা (১২ শতাংশ), তারপরেই রয়েছে যথাক্রমে মিয়ানমার (১০ শতাংশ), আফগানিস্তান (৯ শতাংশ) ও ভিয়েতনাম (৮ শতাংশ) (সারণি ২২)। প্রাথমিক জরিপ থেকে সংগৃহীত উপাত্ত গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে কোইনসাইড করে ওষুধের বৈশ্বিক রপ্তানি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে এসব দেশের আধিপত্য বা একচেটিয়াত্বকে (এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে) নির্দেশ করে। যেসব দেশ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানি করছে সেসব দেশে ওষুধের রপ্তানি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে আর তা করতে হবে এ খাত থেকে আয় আরও বাড়ানোর জন্য।

সারণি ২২: জরিপকৃত ফার্মগুলোর ওষুধ রপ্তানি বাজার

দেশ	রপ্তানিকারী ফার্মের সংখ্যা	রপ্তানির %
শ্রীলঙ্কা	১৩	১২.২
মিয়ানমার	১১	১০.৩
আফগানিস্তান	১০	৯.৪
ভিয়েতনাম	৯	৮.৪
কেনিয়া	৮	৭.৫
কম্বোডিয়া	৮	৭.৫
ফিলিপাইন	৭	৬.৫
যুক্তরাজ্য	৩	২.৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	২	১.৮
ইন্দোনেশিয়া	১	০.৯

উৎস: জরিপের উপাত্ত থেকে হিসাবকৃত।

নুর প্রমুখ (২০১৫) ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের গুণগতমান এবং ম্যানুফ্যাকচারিং/ উৎপাদন পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর দৃকপাত করেন। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প

প্রতিষ্ঠানগুলো আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তথ্যমতে বাংলাদেশের ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ২,৮০৫টি অনুমোদিত উৎস থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে থাকে।

সারণি ২৩: ওষুধ তৈরির কাঁচামালের উৎস

বছর	দেশীয় কাঁচামাল (%)	স্ব স্ব কোম্পানি কর্তৃক বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানিকৃত কাঁচামাল (%)	স্থানীয় সরবরাহকারী (আমদানিকারক) থেকে সংগৃহীত বিদেশী কাঁচামাল (%)	মোট
২০১৪	২১.২	৬৫.৪	১৩.৪	১০০.০
২০১৫	১৯.৯	৬৭.১	১৩.০	১০০.০
২০১৬	২০.২	৬৭.৬	১২.২	১০০.০
২০১৭	১৯.৩	৬৭.৪	১৩.৩	১০০.০
২০১৮	২০.২	৬৫.৬	১৪.২	১০০.০
মোট	২০.২	৬৬.৬	১৩.২	১০০.০

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

দেখা গেছে, ২০১৪ সালে ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামালের ২১.২ শতাংশ দেশে উৎপাদিত হয় আর ৬৫.৪ শতাংশ কাঁচামাল সরাসরি (স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক) বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। অবশিষ্ট ১৩.৪ শতাংশ কাঁচামাল বিদেশে উৎপাদিত হলেও দেশীয় সরবরাহকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় (সারণি ২৩)। ওষুধের কাঁচামাল সংগ্রহের এ প্রবণতা পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুত ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের প্রায় ৮০ শতাংশ আমদানি করা হয়। আরও উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠান যত বড় হয় সে প্রতিষ্ঠানের বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ তত বেশি হয়।

প্রাপ্ত গৌণ উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ওষুধ তৈরির কাঁচামালের প্রায় ৮৬ শতাংশ ভারত ও চীন থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। কাঁচামাল সংগ্রহের অন্য উল্লেখযোগ্য উৎস দেশগুলো হলো জার্মানি, ইটালি, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে, জরিপকৃত ২৬টি কোম্পানির মধ্যে ২৫টিই ভারত ও চীন এ দুটো দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে (সারণি ২৪)। শতাংশ হিসেবে এ দুটো দেশ থেকে আমদানি করা হয় মোট কাঁচামাল আমদানির যথাক্রমে ৪৭ ও ৩৪ শতাংশ। তেরোটি প্রতিষ্ঠান জার্মানি থেকে কাঁচামাল আমদানি করে, যা মোট আমদানির ৫ শতাংশ।

সারণি ২৪: কাঁচামাল আমদানির শীর্ষ পাঁচ দেশ

দেশের নাম	কাঁচামাল আমদানিকারী ফার্মের সংখ্যা	মোট আমদানির %
চীন	২৫	৪৭.০
ভারত	২৫	৩৪.০
জার্মানি	১৩	৫.০
ফ্রান্স	৯	৪.৫
ইতালি	৯	২.০
কোরিয়া	৯	৬.০

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৩.৭। ট্রিপস ও বাংলাদেশ

মারাকেশ চুক্তির অংশ হিসেবে উরুগুয়ে রাউন্ডে ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার (ট্রিপস) প্রবর্তিত হয়। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হলো বৈশ্বিক পর্যায়ে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাভুক্ত সকল দেশ নিজ নিজ দেশের আইনি কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্তে একসেট স্ট্যান্ডার্ড এর বিষয়ে সম্মত হয়। প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে যেকোনো উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ট্রিপস এর আওতাধীন বাধ্যবাধকতাসমূহ প্রযোজ্য হবে। ওষুধের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করে জীবনরক্ষাকারী ওষুধের সহজলভ্যতা এবং জনস্বাস্থ্যের উপর তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কারণে।

ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস ইউনিক ও জটিল ধরনের। প্রতিটি নতুন জেনেরিক ওষুধকে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের আগে অনেকগুলো টেস্ট ও ব্যয়বহুল বিশ্লেষণী পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এ প্রক্রিয়া খুবই সময়সাপেক্ষ এবং ফার্মাসিউটিক্যালস ক্ষেত্রে বিনিয়োগে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে কারণ এ প্রক্রিয়ার যেকোনো স্তরে ব্যর্থতা আসতে পারে। শিল্পের এ বিশেষ দিকটি নতুন উদ্ভাবকদের জন্য মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করে। ওষুধ শিল্পে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি/প্রসারের জন্যও মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। নেরজ্জি (২০০৯) ট্রিপস রেগুলেশনের উপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে নেগোশিয়েসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন যাতে উন্নত দেশগুলোর ওষুধ শিল্পের প্রপার্টি স্বত্বাধিকার বা রাইটস এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বত্বাধিকার বাস্তবায়নে নমনীয়তা এ দুটো বিষয়কে এক্সপ্লয়েট করা যায়। যাহোক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোর তুলনামূলক সুবিধাকে ফরটিফাই করে এবসোলিউট প্রটেকশন এবং এভাবে সুদৃঢ় একচেটিয়াত্বের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এর ফলস্বরূপ বিশ্ব জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে ওষুধের দাম বৃদ্ধি ও ওষুধ প্রাপ্তির সুযোগ হ্রাস এ দুটো বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

বিনিয়োগকারীদের অধিকার ও বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যর মধ্যেকার ভারসাম্য এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের সুযোগ দিতে ট্রিপস চুক্তি কিছুসংখ্যক দেশকে কিছু নমনীয়তার সুযোগ কাজে লাগানোর অনুমোদন দিয়েছে। ট্রিপস চুক্তির এ নমনীয়তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো এ যে, রয়্যালটি প্রদান না করেই স্বল্পোন্নত দেশগুলো অন্য কোনো দেশে উদ্ভাবিত জেনেরিক ব্রান্ডের ওষুধ নিজ দেশে উৎপাদনের পাশাপাশি রপ্তানিও করতে পারে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলো একদিকে যেমন যুক্তিসঙ্গত দামে জনগণকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করতে পাওে, তেমনি অন্যদিকে ওষুধ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে পারছে। কোনো একটি দেশ এলডিসিভুক্ত হলে এ সুবিধা ব্যবহার করতে পারে না অর্থাৎ সে দেশকে ব্রান্ডেড জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করার জন্য সম্পূর্ণ রয়্যালিটি ফি পরিশোধ করতে হয়।

আজম (২০১৪) তিনটি উন্নয়নশীল দেশের (ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল) ট্রিপস চুক্তি বিষয়ক নীতিসমূহ পর্যালোচনা করেছেন এবং বাংলাদেশের মতো এলডিসিগুলোতে এসব পলিসি গ্রহণের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। উক্ত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, প্যাটেন্ট ও ডিজাইন অ্যাক্ট ১৯১১ সংশোধন করার আগে (বাংলাদেশ যেহেতু ট্রিপস চুক্তির নমনীয়তা ক্লজ এর উপর ফোকাস করতে পারছে না)

বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার কম্পিটিশন ল এবং ভারত ও ব্রাজিলের প্রাইস কন্ট্রোল ম্যাকানিজম গ্রহণ করতে পারে। ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের সাম্প্রতিক রিভিশন অনুসারে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস সম্পর্কিত ট্রিপস চুক্তি প্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়ন বা কার্যকরী করার মাধ্যমে ওয়েভার লাভের সুযোগ পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে এলডিসিগুলো ২০৩২ সাল পর্যন্ত। সেজন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন নেই প্রোডাক্ট প্যাটেন্ট সংরক্ষণকে স্বীকৃত দেয়ার এমনকি প্যাটেন্টের অনুমোদন পাওয়ার জন্য আবেদন করার তবে কোনো দেশ এলডিসিভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ওয়েভারের সুযোগ টার্মিনেট হয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্যাটেন্ট স্বত্ব ২২ বছর সম্প্রসারিত করা হয়েছে আর অন্যান্য দেশে ১০-১৫ বছর করা হয়েছে। ইসলাম (২০০৯) এর মতে, উন্নয়নশীল এবং বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এ পৌঁছানো পর্যন্ত বিদ্যমান রেগুলেশনের সংশোধন, এমনকি সাসপেনশনও করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত ট্রানজিশন পিরিয়ডের সুবিধা কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না বা পারবে না। ফার্মাসিউটিক্যালের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট প্যাটেন্ট প্রটেকশন প্রবর্তন করতে হবে এবং ট্রিপসের অন্যান্য শর্তাদি মেনে চলতে হবে। অধিকন্তু বিদ্যমান সুবিধাদি একবার প্রত্যাহৃত হওয়ার পর বাংলাদেশের ওষুধ উৎপাদনকারীরা প্যাটেন্টধারী ওষুধ প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে লাইসেন্স লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হবে। যা আবার তাদের উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিবে এবং এতে বাংলাদেশকে তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে।

ট্রিপস চুক্তি শিথিলকরণ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ২০৩২ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাদেও দেয়া উত্তর থেকে দেখা গেছে, ৫৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এলডিসিতে উত্তরণকে ওষুধ শিল্পের জন্য ঝুঁকি হিসেবে দেখে, ২৩ শতাংশ ঝুঁকির সম্ভাবনা বিষয়ে নিশ্চিত নয় এবং ১৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ধারণা এলডিসিতে উত্তরণ হলে বেশি ঝুঁকি দেখা দিবে না কারণ অনেক অত্যাবশ্যকীয় ড্রাগের জন্য কোনো প্যাটেন্ট ফি পরিশোধ করার দরকার হবে না (সারণি ২৫)।

সারণি ২৫: এলডিসিতে গ্র্যাজুয়েশনের পর ট্রিপস ও তৎসংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

ঝুঁকির সম্ভাবনা	ফার্মের সংখ্যা	শতকরা হার
এলডিসিতে উত্তরণের পর ওষুধ শিল্প ঝুঁকির সম্মুখীন হবে	১৫	৫৭.৭
এলডিসিতে উত্তরণের পর ওষুধ শিল্প ঝুঁকির সম্মুখীন হবে না	৫	১৯.২
ট্রিপস সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির বিষয়ে নিশ্চিত নয়	৬	২৩.১
মোট	**২৬**	**১০০.০**

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৪। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-হুমকী (SWOT) বিশ্লেষণ

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প সম্পর্কিত সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকী উল্লেখ করতে বলা হয়। এ সম্পর্কিত ফলাফল সংক্ষেপে এ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটা বিষয়ে একাধিক উত্তর দেয়ার সুযোগ ছিল।

৪.১। SWOT বিশ্লেষণ: সবল দিক

জরিপে অংশগ্রহণকারী সবগুলো প্রতিষ্ঠান বলেছে তাদের প্রধান সবল দিক হলো তাদের উৎপাদিত ওষুধের গুণগত মান। প্রতিষ্ঠানের সুনাম, আধুনিক যন্ত্রপাতি (যা কারিগরি জ্ঞানের নির্দেশক) এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনী তাদের আরও কিছু সবল দিক।

সারণি ২৬: জরিপকৃত কোম্পানিগুলোর সবল দিক

সবল দিক	পর্যবেক্ষণের সংখ্যা (২৬টি প্রতিষ্ঠান)	% (২৬টির মধ্যে)
প্রোডাক্টের গুণগতমান ভালো	২৬	১০০.০
কোম্পানির বর্তমান সুনাম	১৮	৬৯.২
আধুনিক যন্ত্রপাতি	১৮	৬৯.২
দক্ষ কর্মীবাহিনী/জনবল	১৭	৬৫.৪
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা	১৬	৬১.৫
অবকাঠামোগত সুবিধাদি	১২	৪৬.২
উৎপাদন সক্ষমতা	১০	৩৮.৫
প্রোডাক্টের ধারাবাহিক চাহিদা বৃদ্ধি	৮	৩০.৮
প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি গ্রহণ	৩	১১.৫

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৪.২। SWOT বিশ্লেষণ: দুর্বলতা/দুর্বল দিক

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের দুর্বলতা বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান (৮৮.৪ শতাংশ) তহবিলের অভাবের কথা উল্লেখ করেছে। আরেকটা বড় দুর্বলতা হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সীমাবদ্ধতা। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে মার্কেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোর একটি অন্যতম দুর্বলতা হলো এটি। গ্যাস সরবরাহে অপ্রতুলতা আরেকটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

সারণি ২৭: জরিপকৃত কোম্পানিগুলোর দুর্বলতা/দুর্বল দিক

দুর্বলতা	পর্যবেক্ষণের সংখ্যা (সকল প্রতিষ্ঠান)	% (২৬টির মধ্যে)
তহবিলের অভাব	২৩	৮৮.৫
বিপণন সুবিধার অভাব	১৮	৬৯.২
গ্যাস সমস্যা	১৭	৬৫.৪
দক্ষ কর্মীর অভাব	১২	৪৬.২
বিদ্যুৎ সমস্যা	১১	৪২.৩
কম যোগাযোগ বা কনটাক্ট	৮	৩০.৮
পানি সমস্যা	৪	১৫.৪
কারখানার অবস্থান	৪	১৫.৪
অভিজ্ঞতার ঘাটতি	৪	১৫.৪
নিম্ন উৎপাদন সক্ষমতা	৩	১১.৫

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

ওষুধ শিল্পের দুর্বল দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ওষুধ রপ্তানি ও ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি সম্পর্কিত সমস্যাগুলো তুলে ধরেছি। ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং আমদানিকারক দেশগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ পলিসি (সারণি ২৮)।

সারণি ২৮: রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রধান সমস্যাসমূহ

রপ্তানি সম্পর্কিত সমস্যা	মোট উত্তরের সংখ্যা (মাল্টিপল উত্তর)	%
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা	৪৫	১৯.৭
আমদানিকারক দেশের মান নিয়ন্ত্রণ নীতি	৩৬	১৫.৮
আমদানিকারক দেশগুলোর নীতি	২৪	১০.৫
মাত্রাতিরিক্ত কর, ভ্যাট	২১	৯.২
কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয়সমূহ	২১	৯.২
বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানি বিষয়ক নীতি	১৭	৭.৫
পরিবহন সম্পর্কিত সমস্যা	১৭	৭.৫
অবকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি	৮	৩.৫

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো যে তিনটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলো হলো কাস্টমস সম্পর্কিত সমস্যা, আবগারি শুল্ক/ভ্যাট/কর/লেভি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা (সারণি ২৯)।

সারণি ২৯: কোম্পানিগুলো কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে সম্মুখীন হওয়া সমস্যাসমূহ

সমস্যাসমূহ	ফ্রিকোয়েন্সি (মাল্টিপল উত্তর)	উত্তরদাতার শতকরা হার %
কাস্টমস সম্পর্কিত সমস্যা	১০৪	২৬.৮
মাত্রাতিরিক্ত কর/ভ্যাট/লেভী	৮৬	২২.১৬
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা	৫৩	১৩.৬৬
বাংলাদেশ সরকারের আমদানি নীতি	৫১	১৩.১৪
রপ্তানিকারক দেশের সরকারি নীতি	৩৬	৯.২৮
অবকাঠামোগত সম্পর্কিত সমস্যা	৩০	৭.৭৩
পরিবহন সম্পর্কিত সমস্যা	৯	২.৩২

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৪.৩। SWOT বিশ্লেষণ: সুযোগসমূহ

ওষুধ কোম্পানিগুলোর সামনে ভবিষ্যতে কি কি সুযোগ আসতে পারে জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো তাও উল্লেখ করেছে। ওষুধের কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে ৬১.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করেছে (সারণি ৩০)। কম সুদে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদেশে বাজার সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে তাদের জন্য সুবিধা নিয়ে আসবে। গ্যাস সমস্যার সমাধান, অবকাঠামোর উন্নয়ন, কর, লেভি ইত্যাদি হ্রাস এবং তহবিল বিনিয়োগ ভবিষ্যতে এ শিল্পের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিছু প্রতিষ্ঠান ওষুধ শিল্পের মঙ্গলার্থে এ শিল্পে নিয়োজিতদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

সারণি ৩০: জরিপকৃত কোম্পানিগুলো কর্তৃক উল্লেখিত সুযোগসমূহ

সুযোগ	পর্যবেক্ষণের (২৬টি প্রতিষ্ঠান) সংখ্যা	% (২৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে)
কাঁচামালের সহজলভ্যতা	১৬	৬১.৫
কম সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ	১৩	৫০.০
কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদেশী বাজারের সম্প্রসারণ	১৩	৫০.০
গ্যাস সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান	১১	৪২.৩
অবকাঠামো উন্নয়ন	১০	৩৮.৫
কর, লেভী ইত্যাদি কমানো	১০	৩৮.৫
বিদেশে পূজি বিনিয়োগ করাকে সহজ করা	৯	৩৪.৬
বিদ্যুৎ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান	৮	৩০.৮
প্রশিক্ষণ	৭	২৬.৯
দক্ষ কর্মী সহজলভ্য হবে	৭	২৬.৯
সরকার কর্তৃক ওষুধ শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান	৫	১৯.২
ওষুধ সম্পর্কিত আইন ও বিধিবিধানের পরিবর্তন হবে	৫	১৯.২
পানি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান	৪	১৫.৪

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৪.৪। SWOT বিশ্লেষণ: হুমকি

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের দুটো প্রধান হুমকি হলো কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা এবং ট্রিপস উত্তর উদ্ভূত বিষয়সমূহ (সারণি ৩১)। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো ভ্যাট ও কর বৃদ্ধির সম্ভাবনা, পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব, সরকারি নীতির কঠোরতা এবং দক্ষ জনবলের অভাবকে এ খাতের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান হুমকি বলে মনে করে।

সারণি ৩১: জরিপকৃত কোম্পানিগুলো কর্তৃক সম্মুখীন হওয়া হুমকীসমূহ

হুমকি	পর্যবেক্ষণের সংখ্যা (২৬টি প্রতিষ্ঠান)	% (২৬টির মধ্যে)
কাঁচামালের অভাব	১৬	৬১.৫৪
ট্রিপস রুল ওয়েভার পরবর্তী সমস্যা	১৬	৬১.৫৪
ভ্যাট/করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা	১৪	৫৩.৮৫
পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব	১২	৪৬.১৫
সরকারি নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	১২	৪৬.১৫
দক্ষ জনবলের অভাব	১০	৩৮.৪৬
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন	১০	৩৮.৪৬
গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পর্কিত সমস্যা	৭	২৬.৯২
জমির উচ্চ মূল্য	৫	১৯.২৩
অবকাঠামো (রাস্তা, বন্দর ইত্যাদি)	৪	১৫.৩৮

উৎস: জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।

৫। আলোচনা ও এগিয়ে যাওয়ার উপায়

২০১৪ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প প্রবৃদ্ধি হয়েছে বার্ষিক কমপাউন্ড ১৫.৬ শতাংশ হারে। ওষুধ শিল্পের এ প্রবৃদ্ধির পিছনে প্রধান চালিকাগুলো হলো ক্রমবর্ধমান মাথাপিছু জিএনআই, জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি, রোগের ধরনে পরিবর্তন, জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন, প্রতিষেধক ও পূর্বসতকর্তামূলক ওষুধ বিষয়ে জনগণের উদ্বেগ এবং দ্রুত নগরায়ন। এসব বিষয় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এজন্য প্রত্যাশা করা হয় যে, রিয়েল খাত স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। রপ্তানির নতুন নতুন সুযোগ এ শিল্পের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র বা দ্বার খুলে দিচ্ছে। বিকাশমান বাজারের জনগণ বিশ্বে ব্যবহৃত ওষুধের অর্ধেকেরও বেশি ব্যবহার করবে। এ বিকাশমান বাজারকে টার্গেট করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প বিশ্ব ওষুধ বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হতে পারে। প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও সমর্থনসহ আধুনিক প্রযুক্তি এখাতকে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতাসম্পন্ন হতে সহায়তা করতে পারে। যাহোক পশ্চাৎসংযোগ ক্ষেত্রে এখাতের দুর্বলতা রয়েছে যা আবার এ খাতের বিকাশকে পিছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া এলডিসিতে উত্তরণ পরবর্তী উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ উদ্বেগের একটি বড় বিষয় হয়ে রয়ে গেছে।

৫.১। ওষুধ শিল্পের সুযোগ ও সম্ভাবনা

প্রাথমিক ও গৌণ উৎসসমূহ থেকে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের প্রধান সুযোগ বা প্রবৃদ্ধির চালিকা হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়েছে।

মাথাপিছু জিএনআই বৃদ্ধির কারণে স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয় বৃদ্ধি

বিশ্বব্যাংকের (২০১৯) উন্নয়ন সূচক অনুসারে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনআই ছিল ১,৯০৯ ডলার। এজন্য ধারণা করা হচ্ছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কারণে স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়ণ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ; এ দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬১ মিলিয়ন।[৮] বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যানুসারে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৬.৯ শতাংশ ছিল শহুরে নাগরিক, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য বাবদ মোট ব্যয়ের ৭১.৮ শতাংশ আউট অব পকেট অর্থাৎ নিজস্ব বা ব্যক্তিগত ব্যয়। স্বাস্থ্য সেবা ব্যয়ের দু-তৃতীয়াংশের বেশি ব্যক্তিগতভাবে মেটানো হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে বৈশ্বিক মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড হলো মোট ব্যয়ের ৩২ শতাংশ। গ্রাম এলাকার জনগণের চেয়ে শহর এলাকায় বসবাসকারী জনগণের ক্রয় সক্ষমতা যেমন বেশি তেমনি তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতাও বেশি। ফলে সামনের দিনগুলোতে স্বাস্থ্য সেবার চাহিদার পাশাপাশি ওষুধ সামগ্রীর চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জেনেরিক ওষুধের উর্ধ্বগামী চাহিদা

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করে। মাত্র ২ শতাংশ ওষুধ আমদানি করা হয়। এ দেশীয় ওষুধ প্রস্তুতকারকরা প্রধানত জেনিরিক ওষুধ উৎপাদন করে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধের ৮০ শতাংশই জেনেরিক, ২০ শতাংশ মাত্র প্যাটেন্টেড ড্রাগ। মোট ওষুধের মধ্যে জেনেরিক ওষুধের আধিপত্য দেশের ওষুধ শিল্প বিকাশের একটি শক্তিশালী স্তম্ভস্বরূপ কারণ এসব ওষুধ উৎপাদনের জন্য প্যাটেন্ট বাবদ কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না।

প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং ওষুধ শিল্পের আধুনিকায়ন

আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের কারণে ওষুধের মানের বা স্ট্যান্ডার্ডের উন্নতি হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বিকাশে বিরাট অবদান রাখবে।

সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা

জনগণ দিন দিন অধিকতর স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনগণ তাদের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করছে এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার চাহিদাও বাড়ছে।

জীবন প্রত্যাশা বৃদ্ধি ও জনমিতিক পরিবর্তন

বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুসারে (২০১৮) বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর যা ২০০২ সালে ছিল ৬৬.৪ বছর। বর্তমানে দেশে যুব

---

[৮] স্ট্যাটিস্টা, ২০১৯ (দেখুন https://www.statista.com/statistics/264683/top-fifty-countries-with-the-highest-population-density/)

জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ২০৩৬ সাল নাগাদ দেশে ৫০ বছর উর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা বা অনুপাত বৃদ্ধি পাবে। ইবিএল (২০১৯) এর মতে, জ্যেষ্ঠ বা সিনিয়র নাগরিকরা মূলত ৪ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে: (ক) হৃদরোগ, (খ) ক্যানসার, (গ) ডায়াবেটিস এবং (ঘ) ক্রনিক শ্বাসকষ্ট। লাইফস্টাইল ও পরিবেশগত উদ্বেগ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রনিক রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অধিকন্তু দীর্ঘ জীবন পেতে জনগণ নিয়মিতভাবে চিকিৎসকদের কাছ থেকে পরামর্শ সেবা গ্রহণ করবে এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সেবন করবে। অধিকন্তু জনমিতিক পরিবর্তন, লাইফস্টাইল পরিবর্তন এবং দ্রুত নগরায়নের কারণে রোগের প্রোফাইলেও পরিবর্তন হচ্ছে।

রপ্তানির সুযোগ ও নতুন বাজার

পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা গেছে, বাংলাদেশ থেকে ওষুধ রপ্তানি বাড়ছে। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির মতে রপ্তানির জন্য গত দুই বছরে প্রায় ১,২০০ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস নিবন্ধন পেয়েছে।[৯] কোনো দেশের ওষুধ কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো একটি ওষুধের অনুমোদন পেলেই কেবল একটি দেশ বিভিন্ন দেশে সে ওষুধ রপ্তানি করতে পারে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার দেশ থেকে ওষুধ রপ্তানি বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে। যাহোক এ শিল্পের জন্য আরও নীতি সহায়তা প্রয়োজন।

ফার্মাজিং মার্কেটের সম্ভাবনা

২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিশ্ব ওষুধ বাজার ৩ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ফার্মাজিং বাজারের সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে ওষুধের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। ফার্মাজিং বাজারের দেশগুলোতে মাথাপিছু জিডিপি থ্রেসহোল্ড ২৫,০০০ মার্কিন ডলার এবং ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১ বিলিয়ন ডলারের ব্যয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় বৃদ্ধি, সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রনিক রোগের বোঝা বৃদ্ধিসহ বয়স্ক জনগোষ্ঠী ফার্মাজিং বাজারগুলোতে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টের চাহিদা বৃদ্ধি করছে।[১০] বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। শ্রম খরচ কম হওয়ার কারণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ব্যয় সুবিধা প্রদান করতে পারে। শ্রম ব্যয় বৃদ্ধির কারণে জেনেরিক ওষুধের প্রধান হাব যেমন ভারত ও চীন ব্যয় সুবিধা হারাচ্ছে। বাংলাদেশে শ্রম ব্যয় চীন ও ভারতের চেয়ে ৪-৫ গুণ কম। বিশ্বে ওষুধের দাম বাংলাদেশে সবচেয়ে কম। এর ফলে চীন ও ভারতের চেয়ে বেশি পরিমাণে ওষুধ রপ্তানির সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিনিষেধের কারণে প্যাটেনটেড কাঁচামাল উৎপাদন করতে পারবে না চীন ও ভারত। এজন্য বাংলাদেশ থেকে ওষুধ রপ্তানির সম্ভাবনা অপার।

---

[৯] ইবিএল (২০১৯) এ উদ্ধৃত।

[১০] অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তরের উপর ভিত্তি করে ফার্মাজিং বাজার তিনটি স্তর বা টায়ারে বিভক্ত। টায়ার ১ এর অন্তর্ভুক্ত হলো চীন, স্বাস্থ্যখাতে উচ্চমাত্রায় ব্যয়ের কারণে বিশ্ব ফার্মাজিং বাজারে তার আধিপত্য রয়েছে। ব্রাজিল, ভারত ও রাশিয়াকে নিয়ে টায়ার ২ গঠিত। এ দেশগুলোর বিশেষ দিক হলো দ্রুত বর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠী, ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুকূল সরকারি নীতি। টায়ার ৩ এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, তুরস্ক, মিশর, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্ব ফার্মাজিং বাজারে এ দেশগুলোর অংশ অপেক্ষাকৃত কম।

বাংলাদেশে এপিআই পার্ক প্রতিষ্ঠা

দেশে ওষুধের কাঁচামাল তৈরির লক্ষ্যে শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা দেশীয় উৎপাদকদেরকে ওষুধ তৈরির খরচ কমানোর পাশাপাশি উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করবে। দেশে অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টস (এপিআই) উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ প্রধানত চীন ও ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানি করে। বাংলাদেশ ইউরোপের দেশগুলো থেকেও এপিআই সংগ্রহ করতে পারে। তবে ইউরোপের দেশগুলো থেকে এপিআই সংগ্রহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। মুন্সিগঞ্জের এপিআই পার্কে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হলে কাঁচামালের উপর বিদেশ নির্ভরতা নিশ্চিতভাবে হ্রাস পাবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্থানীয় এপিআই উৎপাদকদের ভ্যাট থেকে অব্যাহতি/রেয়াত প্রদান (২০২৫ সাল পর্যন্ত)

দেশের ওষুধ শিল্পের পশ্চাৎসংযোগ ক্ষেত্রে সহায়তাকল্পে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় এপিআই উৎপাদকদের আমদানিকৃত কাঁচামাল ও রিএজেন্টের উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৫.২। ওষুধ শিল্পের চ্যালেঞ্জ

শক্তিশালী পশ্চাৎসংযোগের অনুপস্থিতি

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানির উপর অত্যধিক নির্ভরতা। আমদানিকৃত এপিআই এর উপর নির্ভরতা প্রাইস কম্পিটিটিভনেসের কারণে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। এজন্য এপিআই এর মূল্যে ওঠানামা (volatility) ২০১৮ সালে ওষুধ উৎপাদকদের কাছে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশে পশ্চাৎসংযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় মুন্সিগঞ্জে এপিআই পার্ক স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সংস্থা সেই একই বছরে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার বাউশিয়া নামক স্থানে এপিআই পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু করে। এ পার্কটি বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির দ্বারা সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে। [১১]

এ পার্কটি ২০১১ সালের শেষদিকে চালু হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণ কাজে বিলম্ব ঘটে। সরকার ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ২৮ জন ওষুধ উৎপাদকের কাছে ৪২টি প্লট হস্তান্তর করে। এ পার্কে স্কয়ার, বেক্সিমকো ফার্মা, গ্লোব, অপসোনিন, এসকায়েফ, জেএমআইকে একের অধিক প্লট

[১১] দু দুবার সংশোধনের পর এপিআই পার্ক স্থাপনের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৩,৬৪০ মিলিয়ন টাকা। প্রকৃত প্রাক্কলিত ব্যয়ের (২,১৩০ মিলিয়ন টাকা) চেয়ে ৭০.৮ শতাংশ বেশি (ইবিএল ২০১৯)। এ পার্কে মোট ৪২টি প্লট রয়েছে। প্রতি একর জমির উন্নয়নে খরচ হবে ৩১ মিলিয়ন টাকা। প্লটের দাম পরিশোধে কোম্পানিগুলো ১০ বছর সময় পাবে। এ ক্যাটাগরিতে রয়েছে (প্রতিটি প্লট ৩.২৭ একর) ৩০টি প্লট, বি ক্যাটাগরিতে (প্রতিটি ২.৩৫ একর) ৫টি আর এস ক্যাটাগরিতে রয়েছে (বিভিন্ন আয়তনের) ৭টি প্লট। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতিভুক্ত ৩২টি প্রতিষ্ঠান ৫৭টি প্লটের জন্য আবেদন করেছে। সিইটিপি প্লান্ট ও বর্জ্য ডাম্পিং ইয়ার্ডসহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে এ পার্কে। সিইটিপি প্ল্যান্ট স্থাপন বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ৮০০ মিলিয়ন টাকা যা কোম্পানিগুলো নির্মাণ করবে। এপিআই পার্ক স্থাপিত হলে ২৫,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বরাদ্দ দেয়া হয়। এপিআই পার্ক স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওষুধের উৎপাদন ব্যয় কমার পাশাপাশি রপ্তানির জন্য ব্যয় সুবিধাও যুক্ত হবে। আশা করা হচ্ছে, এপিআই পার্কে ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি ব্যয় প্রায় ৭০ শতাংশ সাশ্রয় হবে। এতে উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং বৈশ্বিক বাজারে প্রাইস কমপিটিটিভনেস অর্জনে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে। অধিকন্তু অন্যান্য দেশেও এপিআই রপ্তানি করা যাবে। বর্তমানে এপিআই এর বিশ্ববাজার ২৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের ওষুধ শিল্প কেবল থ্রাস্ট সেক্টরই নয় বাংলাদেশ সরকার ওষুধকে "The product of the year 2018" অর্থাৎ বর্ষ পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে। এপিআই পার্ককে কার্যকর করার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে ও বিশ্ব বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে।

বিপণন/বাজারজাতকরণের সমস্যা

মেডিকেল রিপ্রেজেনটিটিভদের প্রচেষ্টার তুলনায় পর্যাপ্ত প্রণোদনা না থাকায় এমআরদের টার্ণওভার রেট অত্যন্ত বেশি। বেশির ভাগ সময় বাজারজাতকরণ খরচ ওষুধের দামকে সামান্য প্রভাবিত করে থাকে। বিপণনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত পেশাদারিত্ব আসেনি বা অর্জিত হয়নি। সরকারি আইনের অভাব এবং ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক বিদ্যমান আইনের অকার্যকর বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়। ওষুধ সামগ্রী বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে চোরাচালানির মতো সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় বা ফরজারিজ এর সম্মুখীন হতে হয় যা প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে এসে থাকে।

মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণের লক্ষ্যে ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের বার্ষিক বাজেটে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ রাখে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্র্যাকটিশনারদের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখা ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। ফলে যেসব ছোট কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তাদেরেকে বড় কোম্পানিগুলোর এগ্রেসিভ প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলা করতে হয়। এর ফলে শীর্ষ কোম্পানিগুলো তাদের নেতৃত্ব দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পারে।

রপ্তানির সমস্যা

দেশে তৈরি ওষুধ রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বড় সমস্যা হলো রেমিট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিনিষেধ আরোপ। বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে ৩০,০০০ মার্কিন ডলার রেমিট করার অনুমোদন দেয়। কোম্পানি ও কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধের নিবন্ধন বাবদ অর্থ ব্যয়, অফিস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মানবসম্পদের পিছনে ব্যয়, বিপণন বা পণ্য প্রসারের ব্যয় এবং বিবিধ আমদানি সম্পর্কিত ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপের ফলে প্রেরিতব্য নমুনার সংখ্যাকে সীমিত করে দেয়। ভ্যাট ছাড়া ৪,০০০ টাকার অধিক মূল্যমানের নমুনা প্রেরণের কোনো অনুমোদন দেয় না বাংলাদেশ সরকার। পর্যাপ্ত নমুনা ছাড়া কোনো বিদেশী ক্রেতাই আমাদের পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে না। আমদানিকারক দেশে ওষুধের নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে কাস্টমসের অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে। অনেক সময় ওষুধের নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অথচ টেস্টিং ও প্রমোশনের উদ্দেশ্যে আমদানিকারক দেশগুলোর ৩০-৪০ শতাংশ নমুনার দরকার হয়। সুতরাং বাস্তবতা অনুধাবন করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে ভ্যাট ছাড়া আমদানিকারক দেশে কমপক্ষে ৩০-৪০ শতাংশ নমুনা প্রেরণের অনুমোদন দেয়া উচিত।

অধিকন্তু ওষুধ রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো বায়ো-ইক্যুয়িভ্যালেন্স টেস্ট সুবিধাদির অভাব।

ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রীর ডাম্পিং

জনসংখ্যা ও চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধির সাথে সাথে মেডিক্যাল বর্জ্যও বাড়ছে। এসব বর্জ্য অপসারণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অন্যথায় পরিবেশগত পরিণতি অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ভয়াবহ হবে।

ট্রিপস এবং এলডিসিতে উত্তরণ

বাংলাদেশ যেহেতু উন্নয়নশীল দেশের দিকে এগোচ্ছে সেহেতু ওষুধ শিল্পের উপর গ্র্যাজুয়েশনের সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক ও প্রস্তুত থাকা দরকার।

৫.৩। এগিয়ে যাওয়ার উপায়

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের অপার সম্ভাবনা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এ শিল্পে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ট্রিপস চুক্তির ৬৬.১ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এলডিসিভুক্ত যেকোনো দেশ ট্রানজিশন পিরিয়ড সম্প্রসারণের জন্য অনুরোধ জানাতে পারবে। সুতরাং বাংলাদেশ ট্রানজিশন পিরিয়ডের মেয়াদ সম্প্রসারণের জন্য বা এলডিসিতে উত্তরণের পরও তা অব্যাহত রাখতে অনুরোধ জানাতে পারে। বাংলাদেশের সিম্পল ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এপিআই উৎপাদনের নিমিত্তে বাংলাদেশ তার প্রযুক্তিগত ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া এ খাতের জন্য আরও গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসব গবেষণা কার্যক্রমে সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা আবশ্যক।

দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোকে তাদের ওষুধ সামগ্রীর উন্নয়নে উদ্ভাবনীমূলক উপায়ের সন্ধান করতে হবে। চিকিৎসক, হাসপাতাল ও ফার্মেসীগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ওষুধের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলে ওষুধ বিতরণ খরচ বেড়ে যায় যা শেষত ভোক্তাদেরই বহন করতে হয়। ওষুধ কোম্পানিগুলোর সার্বিক বিপণন/মার্কেটিং কৌশল বিষয়টি জনগণের কাছে পরিষ্কার হতে হবে। নতুন ওষুধ প্রবর্তনে কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো যাতে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে সেজন্য সরকারের নীতি সমর্থন একান্ত জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জি

Amin, Md. Nurul and Tetsushi Sonobe (2013), "The Success of the Industrial Development Policy in the Pharmaceutical Industry in Bangladesh," GRIPS Discussion Papers 13-07, National Graduate Institute for Policy Studies

Azam, M. Monirul (2014), "The Experiences of TRIPS-Compliant Patent Law Reforms in Brazil, India, and South Africa and Lessons for Bangladesh," *Akron Intellectual Property Journal*, Vol. 7, Iss. 2, Article 1

Bhuiyan, N. U, A. Hakim, and F. Alom (2019), "Competitiveness and Global Prospects of Pharmaceutical Industry of Bangladesh: An Overview," *The Cost And Management*, ISSN 1817-5090, Volume 47, Number 05, September-October.

Bhuiyan, M. A. R., Moniruzzaman and S. Sultana (2011), "Analysis of Pharmaceutical Industries of Bangladesh: Its Challenges & Critical Success Factors), " *Bangladesh Res. Pub. J.* 5, 142-156

EBL (2019), *Pharmaceutical Industry of Bangladesh: The Multi-billion Dollar Industry*, EBL Securities Ltd., Third Edition.

IQVIA Institute (2019), "The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023 Forecasts and Areas to Watch," IQVIA Institute for Human Data Science.

Islam, Towhid (2009), "Implications of the TRIPS Agreement in Bangladesh: Prospects and Concerns," *Macquarie Journal of Business Law*, Vol. 6, pp. 1-19, 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1497458

Islam, S., A. Rahman, and A. K. Mahmood (2018), "Bangladesh Pharmaceutical Industry: Perspective and the Prospects," *Bangladesh Journal of Medical Science*, *17*(4), 519-525. https://doi.org/10.3329/bjms.v17i4.38306

Kremer, Michael (2012), **"**Pharmaceuticals and the Developing World," *Journal of Economic Perspectives*,Volume 16, Number 4, pp. 67–90.

Mohiuddin, M., S. F. Rashid, M. I. Shuvro *et al.* (2015), "Qualitative Insights into Promotion of Pharmaceutical Products in Bangladesh: How Ethical are the Practices?" *BMC Med Ethics* 16, 80. https://doi.org/10.1186/s12910-015-0075-z

Nerozzi, Michelle M. (2002), "The Battle over Life-Saving Pharmaceuticals: Are Developing Countries Being TRIPped by Developed Countries," *Villanova Law Review*, Vol. 47, Iss. 3 [2002], Art. 4

Noor, Rashed, Nagma Zerin and Kamal Kanta Das (2015), "Microbiological Quality of Pharmaceutical Products in Bangladesh: Current Research Perspective," *Asian Pacific Journal of Tropical Disease*, Volume 5, Issue 4, pp. 264-270, ISSN 2222-1808, https://doi.org/10.1016/S2222-1808(14)60781-7

Rahman M. and S. M. Farin (2018), *WTO Decision on TRIPS and Public Health: A Window of Opportunity for Bangladesh's Pharmaceutical Industry*, Research Report 2, Centre for Policy Dialogue

Resnik, David B. (2001), "Developing Drugs for the Developing World: An Economic, Moral, Legal and Political Dilemma," *Developing World Bioethics*, ISSN:1471-8731, Vol 1, No. 1.

Scherer, F. M. (1993), **"**Pricing, Profits, and Technological Progress in the Pharmaceutical Industry," *Journal of Economic Perspectives*, Volume 7, Number 3, Summer. pp. 97–115

UNCTAD (2011), *Local Production of Pharmaceuticals and Related Technology Transfers in Developing Countries: A Series of Case Studies by the UNCTAD Secretariat*, New York and Geneva: UNCTAD, Case Study 2, Bangladesh.